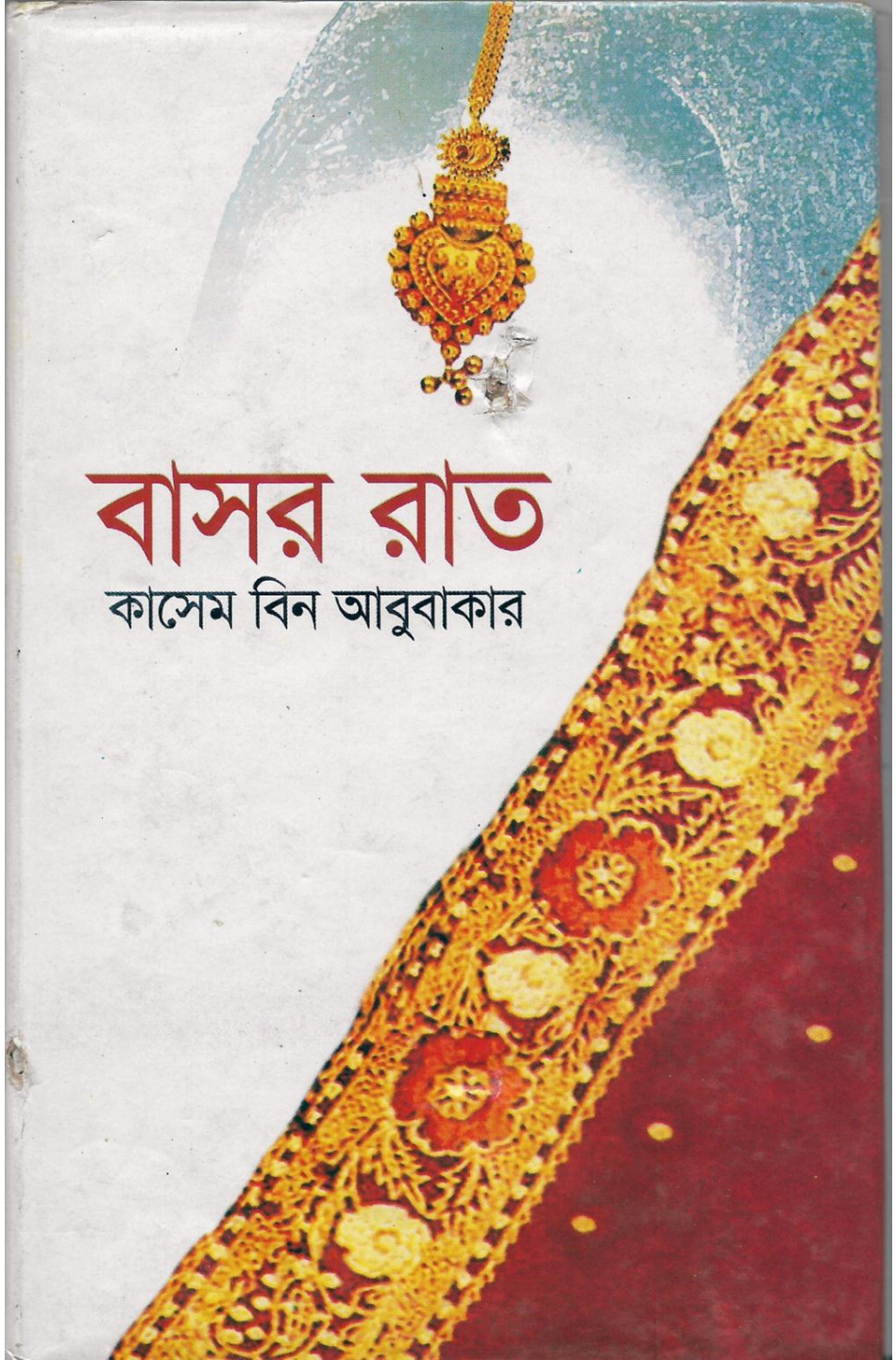

বাসর রাত

কাসেম বিন আবুবাকার

১। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, "শান্তির বাণী প্রচার কর। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং দ্বীনের দুশমনদের গর্দান উড়িয়ে দাও। আল্লাহ জান্নাতের প্রবেশাধীকার লাভ করতে পারবে।"
– বর্ণনায় ঃ হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ)–তিরমিযী।

২। "সঙ্কটের মধ্যেই প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হয়, প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নেয় শুধু জানোয়ার।"
– মাসউদী

৩। "শরীফ লোক বড় হইলে বিনয়ী হয়। আর কমিনা লোক বড় হইলে উদ্ধত হয়।"
–হারিরী

ভূমিকা

মহান বিশ্ব প্রভুর নামে শুরু করছি।

অগণিত পাঠকের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র পেয়ে আমি একের পর এক উপন্যাস লেখার প্রেরণা পাচ্ছি। আমার লেখার কোনো যোগ্যতা নেই। শুধু আল্লাহ পাকের রহমত আছে বলে হয়তো পাঠকের ডাকে সারা দিতে আমার কলম চলছে। দেশের আপামর মানুষের কাছে আমার লেখা বই ভালো লাগে; সেই জন্য হয়তো বা আল্লাহ পাক তাদের মনস্কামনা পূরণ করার অসিলায় আমার আমার কলম দিয়ে কালি ঝরাচ্ছেন। তাই তাঁর পাক দরবারে জানাই 'শতকোটি শুকরিয়া।

ভালো উপন্যাস সবাই পড়তে ভালবাসে। তাই আমি দেশের আনাচে-কানাচে স্বল্পসংখ্যক যে সব ভালো লোক রয়েছেন তাঁদের চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি। এটাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই উপন্যাসের এক নায়ক ও দুই নায়িকা তিনজনই শিক্ষিত ও উঁচু সোসাইটির। তাদের সবকিছু জানতে হলে বইটি পড়ুন। আশা করি, আনন্দ-বেদনা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তা ছাড়া এটা লেখার গতিধারা ভিন্নমুখী, যা আপনাদের কাছে বেশ ভালোই লাগবে। এ উপন্যাসের কাহিনী লেখার সময় দিনাজপুরের তরঙ্গিনী গ্রামের দবির ভাই ও ঝানজিরা গ্রামের সহিদুল ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। সেজন্যে তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

ওয়াস সালাম–

১৬ই ভাদ্র ১৪০০ সাল বাংলা
১২ই রবিউল আউয়াল ১৪১৪ হিঃ
৩১শে আগস্ট ১৯৯৩ইং

এই লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ

❐ ফুটন্ত গোলাপ ❐ ক্রন্দসী প্রিয়া ❐ জ্যোৎস্না রাতে কালো মেঘ ❐ বিলম্বিত বাসর ❐ শ্রেয়সী ❐ অচেনা পথিক ❐ বিদেশী মেম ❐ কি পেলাম ❐ প্রেমের পরশ ❐ শরীফা ❐ প্রেম বেহেশতের ফল ❐ স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ❐ জোঁকা ❐ প্রতীক্ষা ❐ অসম প্রেম ❐ অবশেষে মিলন ❐ একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল ❐ পাহাড়ী ললনা ❐ অনন্ত প্রেম ❐ শেষ উপহার ❐ কলঙ্কের ফুল ❐ শহরের মেয়ে ❐ তুমি সুন্দর ❐ বিয়ে বিভ্রাট ❐ মনের মতো মন ❐ রাগ অনুরাগ ❐ শ্রাবণী ❐ জোনাকির আলো ❐ আগুনের মানব ❐ যেখানে কেউ নেই ❐ মেঘের কোলে রোদ ❐ বিকেলে ভোরের ফুল ❐ কালো মেয়ে ❐ পলাতকা ❐ শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস ❐ বিয়ের খোঁপা ❐ কামিনী কাঞ্চন ❐ প্রেম ও স্বপ্ন ❐ তোমার প্রত্যাশায় ❐ হৃদয়ে আঁকা ছবি ❐ ভাঙ্গা গড়া ❐ কে ডাকে তোমায় ❐ মেঘলা আকাশ ❐ স্বর্ণ তুমি ❐ বধূয়া ❐ বহুরূপিনী ❐ হৃদয় যমুনা ❐ ভালবাসার নিমন্ত্রণ ❐ বড় আপা ❐ আমি তোমার ❐ প্রেমের ফসল ❐ বড় কে ❐ প্রতিবেশীনি ❐ পল্লীবালা ❐ আধুনিকা ❐ ধনীর দুলালী ❐ হঠাৎ দেখা ❐ কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ❐ প্রেম যেন এক সোনার হরিণ ❐ পথে পরিচয় ❐ ধূমায়িত পথ ❐ যেতে নাহি দেব ❐ অমর প্রেম ❐ বিদায় বেলায় ❐ বাসর রাত ❐ বালিকার অভিমান ❐ অবাঞ্ছিত উইল ❐ চেনা মেয়ে ❐ সংসার ❐ কাঙ্খিত জীবন ❐ অলৌকিক প্রেম ❐ মানুষ অমানুষ ❐ ভালোবাসি তোমাকেই ❐ প্রেম ❐ সে কোন বনের হরিণ ❐ ফুলের কাঁটা ❐ সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে ❐ আমিও মানুষ ❐ তুমিও মানুষ ❐ নাফ নদীর বাঁকে (যন্ত্রস্থ) ❐ অপরিচিতা ❐ ফেরারি প্রেমিকা ❐ স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি ❐ জীবন বড় সুন্দর ❐

আজ ঢাকা কমার্স কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রদের ফেয়ারওয়েল ছিল। ফেয়ারওয়েল শেষে পান্থ নিজের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় রেবেকা সেখানে এসে বলল, গতকাল আপনি বলেছিলেন, আজ আমাদের বাসায় যাবেন। সে কথা ভুলে গেছেন বুঝি? চলুন আমার গাড়িতে। আজ আমি নিজে ড্রাইভ করে এসেছি। কেমন ড্রাইভ করতে শিখেছি দেখবেন।

পান্থ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বলে রেবেকাকে বলল, অন্য দিন দেখব। আজ যেতে পারছি না, দুঃখিত।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল।

রেবেকা কয়েক সেকেণ্ড তার গাড়ির দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজের গাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবল, আজ তিন-চার বছর হতে চলল পান্থকে বুঝতে পারলাম না।

বহ্নি নিজের গাড়ির কাছ থেকে রেবেকাকে পান্থর সঙ্গে কথা বলতে দেখে দাঁড়িয়েছিল। সে জানে রেবেকা পান্থকে ভালবাসে। তাই সে যখন কাছে এল তখন জিজ্ঞেস করল, কি রে, পান্থর সাথে কি কথা বললি?

রেবেকা বলল, ও কাল বলেছিল আজ আমাদের বাসায় যাবে। সে কথা বলতে বলল, দুঃখিত, আজ যেতে পারছি না। অন্য দিন যাব।

ও কি কোনোদিন তোদের বাসায় গেছে?

মাত্র দু'বার গেছে। তাও অনেক তোষামোদ করতে হয়েছে।

এর আগে নিশ্চয় তোদের বাসায় যাওয়ার কথা বলেছে?

হ্যাঁ, বলেছে।

যে ছেলে বারবার কথা দিয়ে কথা রাখে না, তুই বলে তার সাথে মিশিস। আমি হলে নজরও দিতাম না। ওর মধ্যে যে কি দেখেছিস তা তুইই জানিস। আমার সঙ্গে একদিন আলাপ করতে এসেছিল। সেদিন যা শুনিয়েছি, তারপর থেকে আর ধারে-কাছে আসে না।

আলাপ করতে এসে কি বলেছিল, আর তুইই বা তাকে কি এমন বলেছিলি বল না শুনি?

তুই সেদিন আসিসনি। ছুটির পর গেটের বাইরে এসে গাড়ির দিকে যাব এমন সময় পান্থ এসে বলল, এই যে বহ্নি দেবী, একটু দাঁড়ান কথা আছে। তার কথা বলার ধরণ দেখে আমি একটু রেগে গিয়েও কি বলে শোনার জন্য দাঁড়ালাম।

পান্থ বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হলেও তেমন পরিচয় হয়নি।

আমি বললাম, তেমন পরিচয় বলতে কি বলতে চাচ্ছেন?

না, মানে বন্ধুত্ব আর কি।

অন্য মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পোষাচ্ছে না বুঝি?

তাদের সঙ্গে আপনার কোনো তুলনা হয় না।

কেন? তাদের মধ্যে যা আছে আমার মধ্যেও তাই আছে?

তা হয়তো আছে। কিন্তু আমার চোখে আপনার মধ্যে যা আছে তা তাদের মধ্যে নেই।

ভালোরা কিন্তু সবাইকে সমান নজরে দেখে।

কি জানি, আমি হয়তো ভালো ছেলে নই।

তাই যদি হয়, তা হলে শুনুন, আমি আপনাদের মতো ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তো দূরের কথা, তাদেরকে ঘৃণা করি। যান, চলে যান; যদি কোনোদিন ভালো ছেলে হতে পারেন, সেদিন বন্ধুত্ব করতে আসবেন। আপনি ছাত্র হিসাবে ভালো বলে বেশি কিছু বললাম না, নচেৎ বন্ধুত্ব করতে আসার মজা পায়ের জুতো খুলে বুঝিয়ে দিতাম। বড়লোকের ছেলে বলে মেয়েদেরকে হাতের পুতুল মনে করেন, তাই না?

রেবেকা বলল, তুই পান্থকে এতবড় কথা বলতে পারলি?

বহ্নি বলল, কেন পারব না? তুই তাকে ভালবাসিস বলে তোর চোখে সে ভালো হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে সে বড়লোকের একটা অভদ্র সন্তান।

রেবেকা জিজ্ঞেস করল, তোর কথা শুনে পান্থ কিছু বলেনি?

বহ্নি বলল, বলেনি আবার, তুই তো মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটলি। আমার কথা শুনে বলল, আপনার নামটা সুন্দর হলেও মনটা এত নীচ তা জানতাম না। তারপর সে আর দাঁড়ায়নি। নচেৎ তার কথার জবাব যা দিতাম তা আমার মনই জানে।

রেবেকা বলল, বাদ দে ওর কথা; তোর কাছে যে নোটটা চেয়েছিলাম দিলি না যে?

কাল তোদের বাড়িতে যাব। আমারটা দিয়ে তোরটা নিয়ে আসব।

তাই আসিস, এখন চল বাড়ি যাই।

পান্থ, রেবেকা ও বহ্নি তিনজনই স্কলার ষ্টুডেন্ট। ওরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ষ্টার মার্ক নিয়ে পাস করেছে। তবে পান্থ ওদের দু'জনের চেয়ে সব বিষয়েই নাম্বার বেশি পেয়েছে। তিনজনই ধনীর ঘরের ছেলেমেয়ে। দেখতে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। খুব আশ্চর্যের কথা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে পান্থ প্রথম, বহ্নি দ্বিতীয় ও রেবেকা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বের হয় তখন পেপারে একে অন্যের ছবি দেখে। তারপর যখন তিনজনেই কমার্স কলেজে ভর্তি হয় তখন নবীন বরণ উৎসবে তাদের বাস্তবে পরিচয় ঘটে। বহ্নি পরিচিত হওয়ার পর থেকে পান্থর সাথে মেলামেশা না করলেও রেবেকা করে। এক সময় তার বাবার বিত্ত বৈভবের কথা জানতে পেরে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনজনের একইরকম রেজাল্ট হলে রেবেকা আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে। ফলে ক্রমশ তাকে ভালবেসে ফেলে। পান্থ কিন্তু প্রেম-ভালবাসা কিছু জানে না।

রেবেকাকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেও তার ঐসব খেয়াল হল না। রেবেকার দু'টো ছোট ভাই আছে। বড়টার নাম সন্দীপ। সে ক্লাস টেনে পড়ে। ছোট প্রবাল। ক্লাস সেভেনের ছাত্র। তাদেরও বাড়ি-গাড়ি আছে। রেবেকা প্রায়ই পান্থদের বাসায় যায়। পান্থ মা-বাবার সঙ্গে অনেক আগেই তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। পান্থর মা-বাবা রেবেকাকে বেশ স্নেহ করেন। পান্থ কিন্তু রেবেকাদের বাসায় যায়নি বললেই চলে। যদিও বা দু'একবার গেছে তাও রেবেকার বারবার তাগিদে। সে নিজে ইচ্ছা করে কোনোদিন যায়নি। পান্থর বাবা যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম রেবেকার মা-বাবা তা জানেন। মেয়ের মুখে পান্থর পরিচয় পেয়ে তাকে খুব স্নেহের চোখে দেখেন। বারবার আসতে বলেন। কিন্তু পান্থ তাদের অত্যধিক স্নেহে বিরক্তি বোধ করে। তাই সে রেবেকাদের বাসায় যায় না।

বহ্নির সঙ্গে বেরেকার খুব ভাব। দু'জন দু'জনের বাসায় যখন-তখন যাতায়াত করে। তবে বহ্নির চেয়ে রেবেকা বহ্নিদের বাসায় বেশি যায়। তাদের বাসায় ক্যারাম, টেবিল টেনিস ও শীতের সময় ব্যাডমিনটন খেলে। দু'জনেরই বেশ কয়েকজন বয়ফ্রেণ্ড আছে। তাদের নিয়ে তারা যেমন খেলাধুলা করে তেমিন মাঝে মাঝে পিকনিকেও যায়।

ডিগ্রীতে পড়ার সময় একদিন রেবেকা অনেক তোষামোদ করে পান্থকে বহ্নিদের বাসায় নিয়ে গেল খেলাধুলা করার জন্য।

রেবেকার সাথে পান্থকে দেখে বহ্নি খুব অবাক হল। কারণ উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময় পান্থ তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে যে ঘটনা ঘটেছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কারো সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা হঠাৎ সামনা-সামনি হয়ে গেলে দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। আজ পান্থ তাদের বাসায় এসেছে দেখে বন্ধু-বান্ধবীদের সামনে অপমান করতে বিবেকে বাধল। তবু হুল ফুটাতে ছাড়ল না। বলল, আরে পান্থ সাহেব যে, কি সৌভাগ্য আমার! আমি মনে করতাম, আপনি পড়ার টেবিল থেকে একদণ্ডও উঠেন না।

পান্থ হেসে উঠে বলল, তাই নাকি! আর আমিও যদি আপনার সমন্ধে ঐ রকম ধারণা করি, তা হলে কি অন্যায় হবে?

বহ্নি বলল, আপনার ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছেন। কথা শেষ করে সে হাতের ব্যাটটা দেখাল। তারপর আবার বলল, আমি সব সময় পড়ার টেবিলে থাকলে আপনি ফার্ষ্ট হতে পারতেন না।

পান্থ আবার হেসে উঠে বলল, তা হলে তাই করছেন না কেন?

অত ধৈর্য আমার নেই।

আমারও অত ধৈর্য নেই। কারো বাড়িতে না গেলেও রেগুলার খেলাধুলায় অনেক সময় ব্যয় করি।

তা হলে প্রমাণ হয়ে যাক?

আমি রাজি।

সেদিন বন্ধু-বান্ধবীরা দর্শক হল আর বহ্নি ও পান্থ টেবিল টেনিস খেলতে নামল। খেলায় বহ্নি ভালো খেলেও গোহারা হেরে গেল। বন্ধু-বান্ধবীরা পান্থর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

বহ্নি টেবিল টেনিস ভালোই খেলে। তবু এভাবে হেরে গিয়ে লজ্জা পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, আপনি মনে হয় রেগুলার খেলেন। আমি তো শখ করে বন্ধুদের সঙ্গে একটু-আধটু খেলি। তবে আপনি যে পাকা খেলোয়াড় তা স্বীকার করছি।

পান্থ ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, চলি।

খেলার আগে সবার সঙ্গে পান্থও ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে খেলতে নেমেছিল। এখন পান্থর কথা শুনে বন্ধু-বান্ধবীরা বলে উঠল, সে কি পান্থ সাহেব, এক্ষুনি যাবেন কি? কিছুক্ষণ রেষ্ট নিন। তারপর নাশতা খেয়ে যাবেন, আমরাও তো যাব।

পান্থ লক্ষ্য করল, বহ্নি কিছু বলেনি। বলল, আমি খেলতে এসেছিলাম। নাশতা খেতে আসিনি। তারপর সবার বাধা উপেক্ষা করে চলে গেল।

পান্থ চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

বহ্নি ও ইভা দু'বোন। তাদের আর কোনো ভাই-বোন নেই। ইভা বহ্নির চেয়ে দু'বছরের বড়। সে ভার্সিটিতে পড়ে। বহ্নি ইভার সঙ্গে তুই-তোকারি করে কথা বলে। ইভা বাড়িতে ছিল না। খেলার শেষ পর্যায়ে এসে তাদের খেলা দেখছিল। সেই প্রথমে বলে উঠল, ছেলেটা কে রে বহ্নি? এত অভদ্র ছেলের সঙ্গে তুই খেলছিলি জেনে ঘেন্না হচ্ছে।

বহ্নি বলল, আমাদের সাথে পড়ে। নাম পান্থ। জানিস আপা, খুব বড়লোকের ছেলে। তার উপর ফার্স্টবয়। তাই এত অহঙ্কার। আর কত অভদ্র তা তো নিজের চোখেই দেখলি।

ইভা বলল, তাকে যদি তাই জানিস, তবে বাসায় নিয়ে এলি কেন? আবার তার সঙ্গে খেললিও?

বহ্নি বলল, আমি আনিনি, রেবেকার সাথে এসেছে।

ইভা রেবেকাকে ছোট বোনের বান্ধবী হিসাবে চেনে এবং স্নেহের চোখে দেখে। প্রথমে বহ্নিকে বলল, আর কোনোদিন যেন ছেলেটা আমাদের বাড়িতে না আসে। তারপর রেবেকাকে বলল, তুমিও তাকে আর এনো না। দেখলে তো কত অভদ্র?

রেবেকা পান্থর ব্যবহারে খুব অবাক হয়েছে। তার প্রতি বেশ একটু রেগেও গেছে। ইভার কথা শুনে বলল, ওরকম করবে জানলে আনতাম না!

ইভা বলল, আমার কথায় তুমি যেন আবার রাগ করো না।

রেবেকা বলল, না আপা রাগ করব কেন?

সেদিন বাসায় ফেরার সময় রেবেকা পান্থর এরকম অভদ্র ব্যবহারের কথা অনেক চিন্তা করল; কিন্ত কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

আর বহ্নি অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করল।

পরের দিন কলেজে এক সময় রেবেকা পান্থকে বলল, কাল আপনার ওভাবে চলে আসা উচিত হয়নি। সবাই আপনাকে অভদ্র ভাবল।

পান্থ মৃদু হেসে বলল, তা ভাবাই তো স্বাভাবিক। কেউ অভদ্রের মতো ব্যবহার করলে তাকে অভদ্র ভাববে না তো কি ভদ্র ভাববে?

রেবেকা বুঝতে পারল, পান্থ ইচ্ছা করেই ঐ রকম করেছে। ভিজে গলায় বলল, করাটা কি আপনার ঠিক হয়েছে? কথা শেষ করে সে চোখের পানি মুছল।

তাই দেখে পান্থ বলল, আমার জন্য মনে হয় আপনাকে কথা শুনতে হয়েছে। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনার সঙ্গে যে গেছি সে কথা মনে ছিল না। আর শুনুন, আমাকে কখনও কারো বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করবেন না।

রেবেকা পান্থ ও বহ্নির কাছ থেকে নোট নেয়। বহ্নিও মাঝে মাঝে রেবেকার কাছ থেকে নোট নেয়। কিন্তু বহ্নি জানে না, রেবেকার সব নোট পান্থর করা। রেবেকাও কোনোদিন সে কথা বহ্নিকে জানায়নি।

এক শীতের বিকেলে পান্থ বহ্নিদের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে হাজির হল।

তখন বহ্নি ও ইভা এবং তাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী ব্যাডমিনটন খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাকে দেখে বহ্নি খুব রেগে গেলেও কোনো কথা বলল না।

ইভাও রেগেছে। তবু সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়ে বলল, কি ব্যাপার, হাতির পা গরিবের কুঁড়ে ঘরে?

পান্থ বিদ্রুপটা গ্রাহ্য করল না। হেসে উঠে বলল, আপনার পরিচয় বললে ধন্য হতাম।

আমি ইভা। বহ্নির আপা।

ধন্যবাদ। এবার একটা অনুরোধ করব। বহ্নি আমার ক্লাসমেট। ছোট বোনের ক্লাসমেটকে তুমি করে বললে আরও একবার ধন্য হতাম।

ইভা বুঝতে পারল, ছেলেটা খুব ইন্টেলিজেন্ট। বলল, তা কি মনে করে এসেছ?

পান্থ বলল, ভালো লাগছিল না; ভাবলাম, কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়ে খেলাধুলা করি। কার বাসায় যাব চিন্তা করতে গিয়ে বহ্নির কথা মনে পড়ল। তাই চলে এলাম।

ইভা চিন্তা করল, আজও যদি সেদিনের মত অভদ্র ব্যবহার করে, তা হলে যা অপমান করার করবে। বলল, ঠিক আছে, এস বস। তারপর আয়াকে ডেকে পান্থর জন্য নাশতা নিয়ে আসতে বলল।

পান্থ বলল, আপা মাফ করবেন; এক্ষুনি নাশতা খেয়ে বেরিয়েছি। আবার খেলে খেলতে পারব না। খেলা শেষে ওসব হবে।

রেবেকার সাথে যেদিন পান্থ খেলতে এসেছিল সেদিন শীলা নামে বহ্নির এক বান্ধবীও ছিল। সবাই তাকে অভদ্র ভাবলেও সে কিন্তু ভাবেনি। তার মনে হয়েছিল, পান্থর নিজস্ব একটা পার্সোন্যালিটি আছে। আজ তাকে দেখে সে খুবই আনন্দিত হল। খেলার কথা শুনে বলল, প্রথমে বহ্নি ও পান্থ সাহেব খেলবেন। তারপর একটা ছেলে ও একটা মেয়ে পার্টনার করে খেলা হবে।

ইভা বলল, বেশ তাই হোক।

বহ্নি এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে পান্থকে দেখছিল শীলার কথা শুনে সে খুশি হল। কারণ সে টেবিল টেনিসের চেয়ে ব্যাডমিনটনে খুব পাকা। খেলা শেখার পর থেকে কেউ তাকে হারাতে পারেনি।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ইভা বলল, কি রে বহ্নি, বসে আছিস কেন? যা, পান্থর সঙ্গে একটা গেম খেল।

বহ্নি কোনো কথা না বলে র‍্যাকেট হাতে মাঠে নামল।

তার পিছু পিছু পান্থও মাঠে নামল।

খেলা শুরু হওয়ার প্রথম দিকে পান্থ বহ্নির আক্রমণ কিছুটা ঠেকাতে পারলেও শেষের দিকে পারল না। দশ পয়েন্টের ব্যবধানে পান্থ হেরে গেল। সকলে হাততালি দিয়ে বলল, সেদিন পান্থ সাহেব টেবিল টেনিসে বহ্নিকে হারিয়েছিলেন, আজ তার প্রতিশোধ তুলল। বহ্নিও মনে স্বস্তি পেল।

পান্থ হাসতে হাসতে বলল, সবাই কি আর সব খেলাতে পারদর্শী হতে পারে? তা ছাড়া খেলাতে তো হারজিত থাকবেই।

ইভা কিন্তু তাদের সাথে একমত নয়। পান্থর খেলা দেখে তার মনে হল, সে ইচ্ছা করে হেরেছে। কারণ প্রথম দিকে বহ্নির আক্রমণ প্রতিহত করেছে দক্ষ খেলোয়াড়ের মতো। তা ছাড়া সে আক্রমণাত্মক মার মারেনি। তবে একেবারে যে মারেনি তা নয়, সাধারণ খেলোয়াড়ের মতো মেরেছে। নিজের অনুমানটা সিওর হওয়ার জন্য বলল, এবার আমি পান্থকে পার্টনার করে খেলব। তারপর বহ্নিকে বলল, তুই কাকে নিয়ে খেলবি ঠিক কর।

বহ্নি বলল, আমি আর খেলব না। তারপর শীলাকে বলল, তুই সুমনকে নিয়ে খেল।

শীলা মনে মনে তাই আশা করেছিল। সে ও সুমন অনেক ম্যাচে চাম্পিয়ন হয়েছে। ব্যাডমিনটনে শীলা ও সুমনের খুব নাম ডাক। তারা খুশি মনে খেলতে নামল।

ইভা ভালো খেললেও তত দক্ষ নয়। তাকে জুটি করে খেলতে নেমে পান্থরও তাই মনে হল। পরপর দু'গেম খেলা হল। দু'গেমেই পান্থ অপটু ইভাকে নিয়ে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে জিতে গেল। সকলে পান্থর খেলার দক্ষতা দেখে ভীষণ অবাক হল। যে নাকি একটু আগে বহ্নির সাথে দশ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরেছে, সে কি করে দু'জন চাম্পিয়ন খেলোয়াড়ের সাথে জিতে গেল? খেলা শেষে শীলা বলল, আপনি ম্যাচ খেললে খুব নাম করতে পারবেন।

তুহিন নামের বহ্নির এক বয়ফ্রেণ্ড বলল, পান্থ সাহেব, সত্যি আপনার কোনো জবাব নেই। কিন্তু একটু আগে বহ্নির সঙ্গে হেরে গেলেন, এটাই আমার দুঃখ।

তুহিনও ধনী ঘরের ছেলে। ভার্সিটিতে পড়ে। শীলার চাচাতো ভাই। শীলাই বহ্নির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই থেকে সে বহ্নিকে মনে মনে ভালবাসে। কথাটা বহ্নিকে না বললেও বহ্নি বুঝতে পেরে তাকে এড়িয়ে চলে।

তুহিনের কথা শুনে পান্থ বলল, কখন কার খেলা খুলে যায় তা কেউ বলতে পারে না। সৈকত নামে ইভার এক বন্ধু বলল, আপনি যাই বলুন না কেন, বহ্নির সঙ্গে যে আপনি ইচ্ছা করে হেরেছেন, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

পান্থ বলল, এটা আপনার ভুল ধারণা।

ইভা বহ্নির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেছে। তাকে প্রবোধ দেয়ার উদ্দেশে বলল, পান্থ ঠিক কথা বলেছে। এখন ওসব কথা বাদ দিয়ে নাশতা খাই আসুন। তারপর আয়াকে ডেকে নাশতা নিয়ে আসতে বলল।

বহ্নি রাগে ফুলতে ফুলতে সেখান থেকে হনহন করে চলে গেল।

সেদিন সবার সাথে নাশতা খেয়ে পান্থ ফিরে এল।

কয়েকদিন পর কলেজে একদিন বহ্নি পান্থকে বলল, আপনি একটা অমানুষ। সেদিন আমাকে অপমান করে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন তাই না? আপনি অভদ্র জানতাম; কিন্তু এত ছোটলোক জানতাম না।

পান্থ মৃদু হেসে বলল, এবার থেকে নিশ্চয় এই অভদ্র ছোটলোককে মন থেকে মুছে ফেলবেন?

বহ্নি রেগে গিয়ে বলল, কবে আবার আপনার কথা মনে রেখেছিলাম যে, মুছে ফেলব?

পান্থ হাসিমুখেই বলল, আপনার এখনকার কথাটাই কিন্তু প্রমাণ করছে, আমাকে নিয়ে ভাবেন। এই কথা বলেই সে সেখান থেকে চলে গেল।

বহ্নি আরও রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে চলে যেতে দেখে চুপ করে অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রেবেকা অল্প দূর থেকে তাদেরকে লক্ষ্য রাখছিল। কিন্তু কোনো কথা শুনতে পায়নি। পান্থ চলে যাওয়ার পর কাছে এসে বলল, কি রে, ওর দিকে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?

বহ্নি রাগটা রেবেকার উপর ঝাড়ল। বলল, তোর ঐ ভালবাসার পাত্রটা নিজেকে কি ভাবে কি জানি? তুই শুধু ওর বাবার ঐশ্বর্য দেখলি; কিন্তু ও যে কতবড় অভদ্র আর ইতর তা যদি জানতিস, তা হলে ভালবাসতিস না। আচ্ছা, তুই যে ওকে ভালবাসিস সে কথা ও জানে?

রেবেকা বলল, না।

ভালো চাস তো ওর কাছ থেকে দূরে থাকিস। ওর মতো ছোটলোক ও অমানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি তোর ভালোর জন্য কথাটা বললাম। যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে একদিন তোর মনের কথা বলে দেখতে পারিস।

পান্থ তোর সঙ্গে কি এমন খারাপ ব্যবহার করল, যে জন্যে তুই তাকে ঐ সব বলছিস? আমার যতদূর মনে হয়, তুই যা বললি তা সে নয়। তবে হয়তো একটু অহঙ্কার থাকতে পারে। যা সবারই থাকে।

আমার তো মনে হয়, ছেলেটা একটু নয়, ভীষণ অহঙ্কারী। কাউকে মানুষ বলে গণ্য করে না। মেয়েদেরকে তো গ্রাহ্যই করে না। তারপর পান্থ ব্যাডমিনটন খেলতে গিয়ে যা করেছিল বহ্নি বলল।

রেবেকা বলল, কিন্তু ওর মা-বাবা খুব ভালো। আমি ওদের বাসায় প্রায়ই যাই। তাদের একটুও অহঙ্কার নেই।

বহ্নি বলল, তা হতে পারে। তবে মা-বাবা ভালো হলেই যে ছেলেও ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই। এখন চল, ক্লাসের সময় হয়ে গেছে।

পান্থর বাবা শরীফ সাহেব উচ্চশ্রেণীর ধনী। তিনি ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। স্ত্রী আফসানা বেগম সংসারের সবকিছু দেখাশোনা করেন। শরীফ সাহেবের ঢাকায় অনেকগুলো বাড়ি। তিনি শ্যামলীর বাড়িতে থাকেন। পান্থ তাদের একমাত্র সন্তান। বিয়ের সাত বছর পর পান্থর জন্ম। একমাত্র সন্তান হিসেবে সে মা-বাবার নয়নের মনি। তাকে দেখাশোনা করার জন্য শিশুকাল থেকে দু'জন আয়া ও দু'জন লোক নিযুক্ত করা আছে। অনেকে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়। কিন্তু পান্থ হীরের চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। সে জন্মাবার পর তার বাবার ব্যবসায় আরও উন্নতি হয়েছে। তিনি বিদেশের ব্যাংকেও ছেলের নামে টাকা জমা রেখেছেন। ওদের দুটো গাড়ি। পান্থর গাড়ির জন্য দুটো ড্রাইভার। সে যেখানেই যাক না কেন সেখানেই ড্রইভার গাড়ি চালাবে এবং সঙ্গে একজন বডিগার্ড থাকবেই। স্বাধীনভাবে একা কোথাও যেতে পারে না। আর তার ফাইফরমাস ও সেবাযত্ন করার জন্য দু'তিনজন আয়া আছে।

একদিন পান্থ মাকে বলল, আচ্ছা মা, আমি তো এখন বড় হয়েছি। কলেজে পড়ছি, ড্রাইভ করতেও পারি। এবার কোথাও যাওয়ার সময় ড্রাইভার বা বডিগার্ড নেব না। কত ছেলেমেয়ে একা একা গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করছে।

আফসানা বেগম বললেন, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোর অনেক তফাৎ। তোর সঙ্গে ড্রাইভার ও বডিগার্ড সব সময় থাকবে। দিনকাল কত খারাপ জানিস? দুস্কৃতকারীরা তোকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ দাবী করবে। মুক্তিপণ না হয় আমরা দিয়ে তোকে নিয়ে এলাম, কিন্তু তোর উপর যদি তারা অত্যাচার করে, তখন কি তুই সহ্য করতে পারবি?

এরপর পান্থ আর কিছু বলতে পারল না।

পান্থ ডিগ্রীতে খুব ভালো রেজাল্ট করে ভার্সিটিতে মাস্টার্স করার জন্য এ্যাডমিশন নিল। পড়াশোনা করার সাথে সাথে জুডো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করল। জুডোর শিক্ষাকোর্স শেষ হওয়ার পর একদিন মা-বাবাকে জানাল, এবার তোমরা আমাকে একটু স্বাধীনতা দাও। আমি একা সবখানে যেতে চাই। ভার্সিটিতে পড়ছি, নিজেকে রক্ষা করার কলাকৌশলও শিখেছি। এখনও তোমরা আমাকে একা কোথাও যেতে দিচ্ছি না কেন?

শরীফ সাহেব কিছু বলার আগেই আফসানা বেগম বললেন, না, তোর একা কোথাও যাওয়া চলবে না। আমাদের দেশের সমাজের অবক্ষয়ের কথা তোকে তো একদিন বলেছি, তবু বারবার একই কথা বলিস কেন? মনে রাখিস, মা-বাবা সব সময় সন্তানের মঙ্গল কামনা করে।

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে শরীফ সাহেব বললেন, তোমার মা ঠিক কথা বলেছে। তুমি যে স্বাধীনতা চাচ্ছ তা পাওয়ার সময় এখনও তোমার হয়নি। যখন হবে তখন আমরা বাধা দেব না।

মা-বাবার কথা শুনে পান্থ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও কিছু বলল না।

রেবেকা ও বহ্নি পান্থর মতো অত ভালো রেজাল্ট করতে না পারলেও অন্যদের চেয়ে ভালো রেজাল্ট করে তারাও ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নিয়েছে। বহ্নির সঙ্গে সেই থেকে পান্থর যোগাযোগ বন্ধ। কিন্তু রেবেকা যোগাযোগ রেখেছে। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর পান্থদের বাসায় যাতায়াতও বেড়েছে।

একদিন রেবেকা বহ্নিকে বলল, চল না আজ পান্থদের বাসায় যাই। সেখানে তার অনেক বন্ধু ও বান্ধবীরা এসে গল্প করে, খেলাধুলাও করে।

বহ্নি পান্থকে যতই খারাপ ছেলে ভাবুক না কেন, তার মন থেকে তাকে দূরে সরাতে পারে না। যখন-তখন হঠাৎ করে তার কথা মনে পড়ে যায়। এটাকে রোধ করার জন্য সে অনেক চেষ্টা করেছে; কিন্তু সফল হতে পারেনি। যাকে দেখলেই গা জ্বালা করে উঠে, তার কথা কেন যে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, সে কথা নিজেই বুঝতে পারে না।

এখন রেবেকার কথা শুনে বলল, তোর কথায় যাব কেন? পান্থ তো আমার সাথে কথাই বলে না।

রেবেকা বলল, কলেজে পড়ার সময় তুই তাকে যেসব কথা বলে অপমান করেছিলি, তারপর কি করে সে তোর সাথে কথা বলবে? ওরকম করে বলা তোর ঠিক হয়নি। ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

বহ্নি রেগে গিয়ে বলল, ক্ষমা চাইতে আমার বয়ে গেছে। আমি ওরকম বাজে ছেলের সাথে কথা বলতে চাই না। আর ওদের বাসায়ও কখনও যাব না।

রেবেকা আর কিছু না বলে চলে গেল।

একদিন ক্লাস শেষ হওয়ার আগে ভীষণ বৃষ্টি নামল। তখন বর্ষাকাল। একবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে থামার নাম নেই। আজ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হচ্ছে। সেদিন রেবেকা ও বহ্নির কারো গাড়ি আসেনি। ক্লাস শেষ হতে রেবেকা পান্থর কাছে এসে বলল, আজ গাড়ি নেই, একটু লিফ্‌ট দেবে? ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নেয়ার পর থেকে তারা তুমি করে বলে।

পান্থ বলল, কেন দেব না।

রেবেকা বলল, একটু অপেক্ষা কর, বহ্নিকে ডেকে আনি। ওরও আজ গাড়ি নেই। তারপর বহ্নির কাছে এসে বলল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি? কখন বৃষ্টি থামবে তার ঠিক নেই। তারচেয়ে চল, পান্থর গাড়িতে চল যাই। আমি পান্থকে বলেছি। সে লিফ্‌ট দিতে রাজি আছে।

বহ্নি বলল, তুই যা। আমি বৃষ্টি কমলে রিকশায় করে যাব।

রেবেকা বলল, আমি তোর কথা বলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে এলাম।

বহ্নি বলল, বললাম তো আমি যাব না, তুই যা।

রেবেকা জানে বেশি জেদাজিদী করলে বহ্নি পান্থকে যা-তা করে বলবে, তাই চুপচাপ ফিরে আসতে লাগল।

পান্থ রেবেকাকে একা ফিরে আসতে দেখে বলল, বহ্নি যাবে না?

না, বৃষ্টি কমলে সে রিকশায় যাবে।

তুমি গাড়িতে গিয়ে বস, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি।

তারপর বহ্নির কাছে এসে বলল, কলেজ লাইফের কথা এখনও মনে রেখেছ দেখছি। তখন বয়স ও জ্ঞানের অপরিপক্কতায় হয়তো কিছু ভুল করে ফেলেছিলাম। ভার্সিটিতে পড়তে এসে সে সব মনে রেখে সহপাঠির সঙ্গে রাগ করে থাকা ঠিক নয়। তবু সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইছি। তারপর হেসে উঠে বলল, তোমাকে কিন্তু তুমি করেই বললাম, আশা করি মনে কিছু করনি। আর তুমিও আমাকে তুমি করে বলবে।

বহ্নি পান্থর কথা শুনে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল।

তাকে এভাবে চুপ করে থাকতে দেখে পান্থ আবার বলল, ঠিক আছে, ক্ষমা যখন করতে পারছ না তখন আর কি করা যাবে। দ্যাটস ইওর উইশ। তারপর সে ফিরে এসে রেবেকাকে বলল, নাহ্, সে আমার গাড়িতে যাবে না।

পান্থকে ক্ষমা চাইতে দেখে বহ্নির রাগ পড়েছে। কিন্তু স্বভাবগত কারণে সে ঐভাবে ছিল। তাকে ফিরে যেতে দেখে বহ্নি চিন্তা করল, ব্যাপারটা খুব অশোভনীয় হয়ে যাচ্ছে। তাই সে পান্থর পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

পান্থর কথা শুনে রেবেকা তার দিকে তাকাতে গিয়ে বহ্নিকে দেখতে পেয়ে বলল, ঐ তো আসছে।

পান্থ রেবেকাকে মাঝখানে বসতে বলে সে দরজার কাছে বসল।

ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে বিপরীত দিকের দরজা খুলে দিল। বহ্নি উঠে বসার পর তার দিকের দরজা বন্ধ করে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল।

রেবেকাদের বাড়ি ধানমণ্ডির সাত নাম্বার রোডে। ড্রাইভার তাদের বাড়ি চেনে। ঝড়বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। তাই গেটের কাছে এসে হর্ন বাজাল। দারোয়ান গেট খুলে দিতে ভিতরে বারান্দার কাছে এসে গাড়ি থামাল।

রেবেকা গাড়ি থেকে নেমে বলল, তোমরাও এস, চা খেয়ে যাবে।

বহ্নি কিছু বলার আগে পান্থ বলল, আজ নয় অন্যদিন। তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বলল।

গাড়ি গেটের বাইরে এনে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাব?

পান্থ বহ্নির দিকে তাকাল।

বহ্নি বলল, কলাবাগান লেকসার্কাস লেনে একশো সাতাশ নাম্বার বাড়ি।

বহ্নি গাড়িতে উঠার পর থেকে বাসায় পৌঁছান পর্যন্ত পান্থর সাথে কোনো কথা বলেনি। গাড়ি থেকে নেমেও কিছু না বলে ভিতরে চলে গেল।

ইভার পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে বারান্দার শেষ প্রান্তে যেখানে রেলিং-এর উপর টবে কতকগুলো গোলাপ ফুল ফুটেছে, সেখানে দাঁড়িয়েছিল। বহ্নিকে পান্থর গাড়ি থেকে

নেমে তাকে কিছু না বলে চলে যেতে দেখে ব্যাপারটা যেন একটু আঁচ করতে পারল। গাড়ির কাছে এসে বলল, পান্থ যে? এস, ভিতরে এস।

বহ্নি কিছু না বলে চলে যেতে পান্থ অপমান বোধ করছিল। ইভার কথা শুনে বলল, আজ আর আসব না আপা, চলি।

ইভা বলল, এস বলছি, আপার কথা রাখবে না?

পান্থ আর না করতে পারল না। গাড়ি থেকে নেমে বলল, কেমন আছেন?

ইভা বলল, পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। ভালো আছি। তারপর তাকে ড্রইংরুমে এনে বলল, তুমি একটু বস আমি আসছি। ভিতরে গিয়ে বহ্নিকে বলল, কি রে, তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে নাকি?

ইভা যে পান্থকে ডেকে এনে ড্রইংরুমে বসিয়েছে তা বহ্নি জানে না। বলল, কেন, কি করেছি?

পান্থ যে তোকে পৌঁছে দিতে এল, তুই তাকে এক কাপ চাও অফার করলি না?

সে যদি মুখের উপর না করে দেয়? তাই করিনি।

তোরা যখন এলি তখন আমি বারান্দায় ছিলাম। তুই চলে আসার পর আমি ওকে ডাকতেই তো এল। ড্রইংরুমে আছে। তুই সেখানে যা। আমি আয়াকে দিয়ে চা নাশতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আপার কথা শুনে বহ্নি একটু অবাক হলেও রেগে গিয়ে বলল, তুই ডেকে এনেছিস, তুই-ই যা। আমি যেতে পারব না।

ইভা বোনের স্বভাব জানে, তাই আর কিছু না বলে আয়াকে নাশতার কথা বলতে যাওয়ার সময় চিন্তা করল, নিশ্চয় ওরা দু'জন দু'জনের প্রতি আসক্ত। কিন্তু তা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করতে রাজি নয়। তাই ওদের মধ্যে রাগ-অনুরাগ চলছে।

ইভা ড্রইংরুম থেকে চলে যাওয়ার দু'তিন মিনিট পর একজন সুদর্শন যুবক এসে ঢুকল। পান্থকে দেখে বলল, আপনাকে তো চিনতে পারছি না?

আমি পান্থ। বহ্নির ক্লাসমেট। আপনি?

যুবকটা পান্থর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে উঠে বলল, আমি মারুফ। ইভার সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে আছে। ইভাকে নিশ্চয় চেনেন?

পান্থ বলল, হ্যাঁ, চিনি।

মারুফ জিজ্ঞেস করল, বহ্নির সাথে দেখা হয়েছে?

পান্থ বলল, ভার্সিটি থেকে আমরা একসঙ্গে এলাম।

এমন সময় ইভা আয়ার হাতে চা-নাশতা নিয়ে এসে মারুফকে দেখে বলল, আরে তুমি? তারপর আয়াকে ওগুলো রেখে আরো একজনের চা-নাশতা নিয়ে আসতে বলল।

আয়া চলে যাওয়ার পর ইভা বলল, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

মারুফ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তার আর দরকার নেই। তুমি আসার আগেই আমরা পরিচয়পর্ব সেরে নিয়েছি। তা বহ্নি কোথায়?

ইভা মিথ্যে করে বলল, তার মাথা ধরেছে। ভার্সিটি থেকে এসে শুয়ে আছে।

পান্থ কিন্তু ইভার চালাকি ধরে ফেলল। আয়া চা-নাশতা নিয়ে এলে সামান্য কিছু খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মারুফ ইভাকে বলল, ছেলেটা বহ্নির সঙ্গে ভার্সিটি থেকে এসেছিল, অথচ তুমি তাকে আপ্যায়ন করালে, ব্যাপারটা যেন একটু ঘোলাটে মনে হচ্ছে? দেখো, শেষকালে ছোট বোনের ক্লাসমেটের সঙ্গে ইয়েটিয়ে করে এই বেচারাকে যেন আবার দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিও না।

ইভা হাসতে হাসতে উঠে এসে তর্জনী তুলে বলল, খবরদার, ওরকম আজেবাজে কথা বলবে না। বহ্নি শুনলে কি ভাববে বল তো? তা ছাড়া আমার মনে কষ্ট হয় না বুঝি?

মারুফও হাসতে হাসতে বলল, তা কি আর বুঝিনি। আজ চার বছর ধরে আমাদের সম্পর্ক। সেখানে কোনো ছেলেমেয়ে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে আমরা কি সহজে ছেড়ে দেব। যে বেটা বেটী আসবে তাদেরকে শেষ করে দেব না?

ইভা হেসে ফেটে পড়ে বলল, তা তো নিশ্চয়ই। এখন বল, ফোন না করে হঠাৎ এলে যে?

মারুফ বলল, বৃষ্টি হচ্ছে দেখে শুধু তোমার কথা মনে পড়তে লাগল। ভাবলাম, এই বৃষ্টির দিনে দু'জনে মিলে সিনেমা দেখতে খুব আনন্দ লাগবে। তাই অফিস ছুটির আগেই ফোন না করে চলে এলাম। সেই সঙ্গে তোমাকে একটা সারপ্রাইজও দিলাম। তুমি খুশি হওনি?

ইভা বলল, হ্যাঁ, খুশি হয়েছি।

মারুফ বলল, তা হলে নো লেট, বি কুইক।

মারুফ ইভাদের বাসায় এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন খেলতে আসে। সেদিন ইভার সঙ্গে পরিচয় হয়ে তাকে খুব ভালো লাগে। ইভারও মারুফকে ভালো লাগে। তারপর ক্রমশঃ তারা একে অপরকে ভালবেসে ফেলে। মারুফের বাবা অগ্রণী ব্যাংকের হেড অফিসের একজন বড় অফিসার। মারুফ কমার্সে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বছরখানেক হল একই ব্যাংকে খুব ভালো পোস্টে আছে। ওদের দেশের বাড়ি নগরবাড়ি। সেখানেও বেশ জায়গা-জমি আছে। ঢাকায় বনানীতে ওর বাবা বাড়ি করেছেন।

ইভাকে মারুফের সাথে বেশি মেলামেশা করতে দেখে তার বাবা আনোয়ার সাহেব মারুফের খোঁজখবর নিয়ে দেখেছেন, সে তার মেয়ের উপযুক্ত। ইভার পরীক্ষার পর তাদের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। মারুফ কিছুদিনের মধ্যে ব্যাংকিং-এর উপর ট্রেনিং নিতে জার্মান যাবে। সেখান থেকে ফিরে এলে তাদের বিয়ে হবে। এনগেজমেন্টের আগে তারা যতটা না মেলামেশা করত এখন তার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। যখন ইচ্ছা তারা একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করে। দু'পক্ষের গার্জেনরা আগেও যেমন কিছু মনে করেন নি, এখনও করেন না। কিন্তু বহ্নি তাদেরকে এভাবে মেলামেশা করতে দেখে একদিন ইভাকে বলল, আপা, তুই দেখছি মারুফ ভাইয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছিস। বিয়ের আগে এত মেলামেশা ভালো নয়। বিয়ের পরে আর কোনো ইন্টারেষ্ট থাকবে না।

ইভা বলল, তুই যে দেখছি এরই মধ্যে পেকে গেছিস। বলি, তোর এই অভিজ্ঞতা হল কি করে?

এ কথা সবাই জানে; অভিজ্ঞতা আবার কি?

কি রে, তুইও কাউকে ভালবাসিস নাকি?

বহ্নি রেগে উঠে বলল, আমি ওসব ভালবাসা-টালবাসার ধারধারি না। কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিলে তো ভালবাসাবাসি হবে।

কেন, তোরও তো অনেক বয়ফ্রেণ্ড আছে। তাদের কাউকে তোর পছন্দ হয় না?

না। তাদের সঙ্গে শুধু খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য ফ্রেণ্ডশীপ করেছি।

আরও কিছুদিন যাক, দেখব তোর কথা কতটা সত্য। আমার তো মনে হয়, তুই পান্থকে ভালবাসিস।

বহ্নি আরও রেগে গিয়ে বলল, দেখ আপা, অমন অ্যাবসার্ট কথা বলবি না। পান্থকে আমি ঘৃণা করি।

কেন? সে বড়লোকের ছেলে, স্কলার স্টুডেন্ট, দেখতেও খুব সুন্দর।

সে যাই হোক না কেন, তাতে আমার কি? তুই যে তার অত গুণ গাইছিস, সে যে কত অহঙ্কারী ছেলে তা জানিস?

যে ছেলের সব দিক ভালো, তার একটু-আধটু অহঙ্কার তো থাকবেই। ওটা কোনো দোষের না। তুই আমার চেয়ে সুন্দরী বলে তোরও তো অহঙ্কার আছে।

আসলেও তাই। শুধু ইভা কেন বরং তাদের সোসাইটির অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে বহ্নি অনেক বেশি সুন্দরী। তবে বহ্নির মেজাজ একটু কড়া। সামান্য কথাতেই চট করে রেগে যায়। কিন্তু মন খুব সরল। কোনো ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারে না। যা বলার সামনাসামনি বলে ফেলে।

ইভার কথা শুনে বলল, দেখ, আমাকে বেশি রাগাবি না। তারপর সে নিজেই সেখান থেকে চলে গেল।

পান্থ একদিন লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিচ্ছিল। সেই সময় বহ্নি এসে লাইব্রেরিয়ানের হাতে কার্ড দিয়ে বই চাইল।

লাইব্রেরিয়ান বলল, সরি আপা, এই বইটার লাস্ট কপি পান্থভাই এক্ষুনি নিলেন।

বহ্নি কার্ডটা ফেরত নিয়ে একপলক পান্থর দিকে তাকিয়ে চলে যেতে লাগল। পান্থ তার পিছনে আসতে আসতে বলল, বহ্নি শোন।

বহ্নি দাঁড়িয়ে পড়ল।

পান্থ কাছে এসে বলল, বইটা আজ তুমি নিয়ে যাও। তোমার কাজ সারা হয়ে গেলে আমাকে দিও।

বহ্নি কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, পরে আমি লাইব্রেরী থেকে নেব। তারপর সে হন হন করে চলে গেল।

পান্থ কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করল, বহ্নি আজও তাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

পান্থ মাঝে মাঝে চিন্তা করে তার সাথে যত মেয়ের পরিচয় হয়েছে, তারা তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে বা মিশতে পারলে যেন বর্তে যায়। আর রেবেকা-তো আমার জন্য পাগল। তাকে যত এড়িয়ে চলতে চাই তত যেন আরো বেশি মিশতে চায়। রেবেকা কোনো অংশে কম না। তবু কেন জানি পান্থ তাকে মোটেই পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু বহ্নি যেন সবার চেয়ে ব্যতিক্রম। মেয়েটার একটা পার্সোন্যালিটি আছে। যদিও সেটাকে অনেক সময় অহঙ্কার বলে মনে হয়। কিন্তু পান্থ বুঝতে পারে, সুন্দরী মেয়েদের যে অহঙ্কার থাকে তা বহ্নির নেই।

একদিন রেবেকা পান্থদের বাসায় গিয়ে বলল, আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলব বলে এসেছি। এখন অবশ্য বলতাম না; কিন্তু বাবা-মাকে এমন কিছু কথাবার্তা বলতে শুনেছি, যার ফলে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

পান্থ বুঝতে পারল রেবেকা কি বলবে। বলল, দেখ রেবেকা, তোমাকে আমি আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে একটু অন্য রকম ভাবি। এমন কথা বলো না, যা শুনে আমি দুঃখ পাব।

রেবেকা পান্থর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ভাবল, সে তা হলে তাকে ভালবাসে। বলল, আমি তোমাকে দুঃখ দেব এটা ভাবতে পারলে? তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, পান্থ, আমি তোমাকে কলেজ লাইফ থেকে ভালবাসি। এতদিন কথাটা বলতে সাহস করিনি। কয়েকদিন আগে বাবা মাকে বলছিল, তার এক বন্ধুর ছেলে বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছে। তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। তাই আমার মনের কথা তোমাকে জানালাম।

পান্থ অনেক আগেই জানতো, রেবেকা তাকে একদিন-না-একদিন এ কথা বলবেই। তাই সেও উত্তর ভেবে রেখেছিল। বলল, রেবেকা, তুমি বিরাট ভুল করে ফেলেছ। কাউকে ভালবাসতে হলে তার মনের খবর আগে জানা উচিত। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি একতরফা ভালবাসার ফল কোনোদিন ভালো হয় না। দাম্পত্য জীবনে দু'জনের একজনও সুখী হয় না। তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ের এটা জানা উচিত ছিল। আমি এখন পড়াশোনা করছি। বিয়ের কথা চিন্তা করা অবান্তর। তা ছাড়া কবে বিয়ে করব তারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। গার্লফ্রেণ্ডদের মধ্যে তোমাকে আমি অন্য চোখে দেখি। তাই বলে সেটাকে তুমি ভালবাসা, আইমিন প্রেম বলে ভাবতে পার না। আমি মনে করি, তুমিও আমাকে তোমার বয়ফ্রেণ্ডদের মধ্যে বেশি পছন্দ করে। তাই বলে প্রেম নিবেদন করা তোমার ঠিক হয়নি। তুমি হয়তো আমার কথা শুনে দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আর যদি বল, আমি কথা দিলে তুমি তোমার বাবা-মাকে বলে এনগেজমেন্ট করে রাখার ব্যবস্থা করবে, তা হলেও আমি অপারগ। কারণ জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া কারো উচিত নয়। তোমার কথা রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ, তোমার মতো আরো অনেকে যদি আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে, তা হলে আমি কি সবার মন রক্ষা করতে পারব? না রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব? তুমি জান না, তোমার আগে আরও বেশ কয়েকজন মেয়ে প্রেম নিবেদন করেছে। তোমাকে তবু এত কথা বললাম, তাদেরকে এক কথায় বিদায় করে দিয়েছি।

রেবেকা পান্থর কথা শুনে যেমন দুঃখ পেল তেমনি নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করল। কিছু না বলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাসায় ফিরে এল। তখন তার অনেক দিন আগের বহ্নির কথা মনে পড়ল, 'পান্থ যে কতবড় অভদ্র আর অহঙ্কারী, যেদিন তুই তার কাছে প্রেম নিবেদন করবি সেদিন বুঝবি।' সে সময় তার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ তার প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল।

পান্থর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। তার সময় যেন কাটতে চায় না। বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতেও আর ভালো লাগে না। এতদিন পড়াশোনার মধ্যে বেশি সময় ব্যয় করত। এখন জীবনটা তার কাছে খুব একঘেয়েমি লাগতে লাগল। কোনো কিছুতেই মন বসছে না। এভাবে কয়েক মাস কাটিয়ে দিল। তারপর রেজাল্ট বেরোবার পর মা-বাবাকে জানাল, আরও লেখাপড়া করার জন্য আমেরিকা যাবে।

স্বামী কিছু বলার আগে আফসানা বেগম কাতর স্বরে বললেন, তুই আমাদের একমাত্র সন্তান। তোকে ছেড়ে আমরা থাকব কি করে? তোর বাবা যেতে দিলেও আমি দেব না।

শরীফ সাহেব স্ত্রীকে থামতে বলে বললেন, পড়াশোনা করতে বিদেশ যাবে তা খুব ভালো কথা। কে না চায়, ছেলে উচ্চশিক্ষিত হোক। আমি তোমাকে সে ব্যাপারে বাধা দেব না। কিন্তু চিন্তা করে দেখ, আমাদের এই বিশাল ঐশ্বর্য ও ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করবে কে? আমি আর কত দিক সামলাব? তোমাকে আমি কোনো কিছুতে জোর করব না। নিজেই চিন্তা-ভাবনা করে যা ভালো বুঝবে করবে।

এরপর একদিন আফসানা বেগম ছেলেকে বিদেশ না-যাওয়ার জন্য অনেক করে নিষেধ করলেন। শেষে বললেন, যদি যাস, তা হলে হয়তো আমি মরেই যাব। ফিরে এসে আর দেখতে পাবি না।

পান্থ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বিদেশে পড়তে যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিয়ে বাবার ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করার সিদ্ধান্ত নিল। মাকে বলল, তুমি বাবাকে বল, এখন থেকে ব্যবসাপত্রে তাকে সাহায্য করব।

স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলের কথা শুনে শরীফ সাহেব তার জন্য আলাদা অফিসের ব্যবস্থা করলেন।

পান্থ কিছুদিন অফিস করে হাঁফিয়ে উঠল। অফিসের ছোট বড় সব শ্রেণীর স্টাফরা তাকে অযাচিত সম্মান করে। এত সম্মান করার হেতু সে খুঁজে পায় না। সম্মানের আধিক্য এবং তোষামোদের কারণে তার মন দিন দিন বিরক্ত হয়ে উঠল। তা ছাড়া এখানেও একঘেয়েমি জীবন অনুভব করে তার অসহ্য লাগতে লাগল। শেষে সে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আবার বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে সময় কাটাতে লাগল। কিন্তু তাও বেশি দিন তার ভালো লাগল না। এর মধ্যে আরও দু'জন বান্ধবী তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। তাদের কাউকেই পান্থর পছন্দ হয় না। তার মনে হয়, তাকে কেউ ভালবাসে না। তার বাবার অতুল ঐশ্বর্য আছে বলে তারা তাকে বিয়ে করতে চায়। সে দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন দুটো গাড়িতে করে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে পান্থ সোনারগাঁ রাজবাড়ী দেখতে গেল। সেখান থেকে ফেরার সময় মাধবপুরে পান্থর গাড়ি একটা চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের ভিখারিণীকে চাপা দিল। তার কোলে বছর খানেকের একটা ছেলে ছিল। ছেলেটা তখনই মারা গেল। আর ভিখারিণী মেয়েটা খুব আহত হল।

পথচারীরা ও সেখানকার লোকজন তাদের আটক করে ড্রাইভারকে মারতে লাগল। এরা সবাই ভয় পেলেও পান্থ সাহস করে তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল, আপনারা থামুন। ড্রাইভারকে মেরে ফেললেই কি মরা ছেলে বেঁচে যাবে? না তার মা সুস্থ হয়ে যাবে? কেউ ইচ্ছা করে অ্যাক্সিডেন্ট করে না। তারচেয়ে ছেলেটার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করুন। আমরা তার মাকে চিকিৎসা করানর জন্য মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর একজন মুরুব্বি লোকের হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই দিয়ে ছেলেটার ব্যবস্থা করুন। ওর মায়ের চিকিৎসার ভার আমি নিলাম। ভালো হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণসহ তাকে এখানে দিয়ে যাব। তারপর উপস্থিত লোকদের আরও অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ভিখারিণী মেয়েটাকে নিয়ে ঢাকায় এসে মেডিক্যালে ভর্তি করে দিল।

পান্থ রেগুলার মেডিক্যালে মেয়েটাকে দেখাশোনা করতে লাগল। জ্ঞান ফেরার পর মেয়েটার পরিচয় জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটা বলল, আমার নাম আঙ্গুরী। আমরা তিন বোন তিন ভাই। আমি সকলের ছোট। বাবা পরের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। তিন ভাই বড়। তারা বিয়ে করে আলাদা সংসার করছে। বোনদেরও সব বিয়ে হয়ে গেছে। আমার যখন বিয়ে হয় তখন বাবা জামাইকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। বিয়ের পর সেই টাকার জন্য আমার স্বামী ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী খুব অত্যাচার করত। বাবা সব জেনেশুনেও দুরাবস্থার কারণে টাকাটা দিতে পারেনি। তাই এক ছেলের মা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী মারধর করে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। বাবার বয়স হয়েছে। খাটাখাটনি তেমন করতে পারে না। তাই আমি ভিক্ষে করে মা-বাবার কাছে থাকি।

মেয়েটার কথা শুনে পান্থ চিন্তা করল, দেশে এরকম কত হাজার হাজার মেয়ে যৌতুকের স্বীকার হয়ে চরম দুর্ভোগ সহ্য করে জীবন যাপন করছে। তাদের দুরাবস্থার কথা ভেবে ঠিক করল, দেশের দরিদ্র লোকদের জন্য আমাদের মতো ধনী ও শিক্ষিত ছেলেদের কিছু করা উচিত। প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন পর মেয়েটি সুস্থ হলে পান্থ তাকে তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিল। সেই সময় তার বাবার হাতে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বলল, ভালো ছেলে দেখে আপনার মেয়ের আবার বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

মেয়েটির বাবা বোবাদৃষ্টিতে পান্থর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না। এক সময় তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পান্থ তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বলল, আপনার মৃত নাতির বদলে টাকাটা দিচ্ছি না; মেয়েটির ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দিলাম। কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে এল।

এই ঘটনার পর থেকে পান্থর পরিবর্তন শুরু হল। সব সময় চিন্তা করতে লাগল, কি করে গরিবদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যায়?

একদিন রাতে পান্থ এসব চিন্তা করছিল। হঠাৎ তার মন বলে উঠল, তোমার বাবার অগাধ ধন-সম্পদ। তুমি আরাম ও ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ। আর অন্যদিকে দেশের লক্ষ কোটি মানুষ একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করছে। কত অসহায় ও অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কত লোক আর্থিক অনটনের জন্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছে না। কত গরিব লোক অর্থাভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। তবু তাদের জীবনের গতি থেমে নেই। আর তুমি এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও শান্তি পাচ্ছ না। কি করবে না-করবে ভেবে ঠিক করতে পারছ না। একজন শিক্ষিত ও সামর্থ্যবান ছেলে হয়ে তাদের জন্য তোমার কি কিছু করা উচিত নয়? তুমি ইচ্ছা করলে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষের অনেক উপকার করতে পার। জেনে রেখ, ভোগের মধ্যে শান্তি নেই, ত্যাগের মধ্যেই শান্তি। যারা শুধু নিজেদের ভোগবিলাসের জন্যে ব্যস্ত থাকে তারা কোনোদিন শান্তির মুখ দেখতে পায় না। বরং তারা আরও বেশি ভোগবিলাসের জন্য অমানুষ হয়ে উঠে। গরিবদের প্রতি দয়ামায়া করা তো দূরের কথা, নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য গরিবদের রক্ত চুষে নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তুমি যদি প্রকৃত শান্তি পেতে চাও, তবে এই ভোগবিলাসের জীবন ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাও। তাদের অবস্থা বুঝতে পারার পর উপকার করার চেষ্টা কর। আর একটা কথা মনে রেখ, তোমার বাবার ঐশ্বর্য আছে বলে গরিবদের শুধু দান করলেই দেশের বা দশের কোনো উপকার করা হবে না; সেই ঐশ্বর্য কোনো উৎপাদন খাতে বা এমনভাবে কাজে লাগাবে যা সাধারণ মানুষের উপকারে আসে। এসব চিন্তা করতে করতে পান্থ সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারল না। শেষে সিদ্ধান্ত নিল, তাদের উচ্চ সমাজ থেকে সাধারণ মানুষের সমাজে বাস করবে এবং তাদের উপকার করার চেষ্টা করবে। কয়েকদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করল, মা-বাবাকে না জানিয়ে প্রথমে কোনো গ্রামে অথবা মফস্বল টাউনে গিয়ে উঠবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।

সত্যি সত্যি পান্থ একদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার পর সবার অলক্ষ্যে অজানার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। একা একা সে কোনোদিন কোথাও যায়নি। নিজের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনেও চড়েনি। গেটের বাইরে এসে হেঁটে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াল। ফাঁকা রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে তার মন মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে যেতে ইচ্ছা করল। এখান থেকে গাড়িতে করে এতদিন যাতায়াত করেছে; আজ একা দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব ভালো লাগল। মনে হল, সে যেন বন্দি খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়েছে। একটু পরে একটা স্কুটার এসে তার সামনে দাঁড়াল।

স্কুটারের ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কোথাও যাবেন নাকি সাহেব?

তার কথা শুনে পান্থ চিন্তা করল, তাই তো? কোথায় যাবে? একবার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে কমলাপুর ষ্টেশন দেখতে এসেছিল। হঠাৎ সে কথা মনে পড়তে বলল, কমলাপুর ষ্টেশন যাবে?

ড্রাইভার বলল, আসুন, কেন যাব না।

পান্থ যখন কমলাপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছাল তখন শুনতে পেল, মাইকে এ্যানাউন্স হচ্ছে, "তিন নাম্বার প্ল্যাটফরম থেকে দিনাজপুরের তিস্তা এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র

পনের মিনিট বাকি। যাত্রীদেরকে গাড়িতে উঠে নিজেদের সীটে বসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।" পান্থ তাড়াতাড়ি করে দিনাজপুরের টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, আটটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

পান্থ বাড়ি থেকে চলে আসার ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সবাই জেনে গেল, সে বাড়িতে নেই। আফসানা বেগম চাকর-চাকরানিদের নিয়ে বাড়ির সবখানে খুঁজলেন। না পেয়ে তাদেরকে ভীষণ রাগারাগী করতে লাগলেন। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে সেও কিছু বলতে পারল না। শেষে অফিসে স্বামীর কাছে ফোন করলেন।

শরীফ সাহেব বললেন, তুমি কোনো চিন্তা কর না। পান্থ হয়তো কোনো বন্ধু বান্ধবীর বাসায় গেছে; সময় মতো ফিরে আসবে।

আফসানা বেগম স্বামীর কথায় স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। ছেলের ঘরে গিয়ে চারপাশে তাকিয়ে খাটের উপর একটা কাগজ দেখতে পেলেন। কাগজে কিছু লেখা রয়েছে দেখে পড়তে লাগলেন–

মা ও বাবা,

তোমাদের অতিরিক্ত আদরযত্ন ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হত, আমি যেন একটা সোনার খাঁচায় বন্দি। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। আমি একজন পঁচিশ বছরের উচ্চশিক্ষিত যুবক। তবু তোমরা আমাকে একা একা কোথাও যেতে দাওনি। ছোট শিশুর মতো আগলে রাখ। তাই কিছু দিনের জন্য দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকব বলে চলে যাচ্ছি। কোথায় গিয়ে থাকব তা ঠিক না করেই বেরিয়ে পড়লাম। তোমরা আমার জন্য দুশ্চিন্তা করবে না। যেখানেই থাকি না কেন পত্র দিয়ে জানাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, আমি কোথাও বেড়াতে গেছি। তোমরা আমার উপর আস্থা রেখ, দেখবে আমি ঠিক ফিরে আসব। আমি বড় হয়েছি, পড়াশোনাও যথেষ্ট করেছি। ভালো মন্দ বোঝার মতো জ্ঞানও হয়েছে। প্রাসাদে জন্ম নিয়ে প্রাসাদের মানুষদের জেনেছি। এবার সাধারণ ও গরিব মানুষদের জানতে চাই। তাই একটা ঝুঁকি নিলাম। কিছুদিন তাদের সাথে থেকে দেখব, তারা কিভাবে জীবন যাপন করে। তোমরা আমার খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করবে না, থানা-পুলিশও করবে না। আমি নিজেই তোমাদের কাছে ফিরে আসব। তোমরা আমাকে দো'য়া কর।

ইতি

তোমাদের পান্থ।

আফসানা বেগম দু'বার চিঠিটা পড়লেন। পড়ার সময় চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। এক সময় তা গাল বেয়ে পড়তে লাগল। ছেলের অমঙ্গল হবে ভেবে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললেন, "আল্লাহ তুমি আমার পান্থকে ভালো রেখ। তাকে তাড়াতাড়ি আমার কোলে ফিরিয়ে এনে দাও।"

শরীফ সাহেব আজ আগেই অফিস থেকে ফিরলেন।

আফসানা বেগম চিঠিটা স্বামীর হাতে দিয়ে ভিজে গলায় বললেন, পান্থর খাটের উপর ছিল।

শরীফ সাহেব চিঠি পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কোনো কথা বলতে না পেরে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

আফসানা বেগম ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, কিছু বলছ না কেন? ওকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর।

শরীফ সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? পান্থ তো ছেলেমানুষ না। নিজের ইচ্ছায় গেছে। তাকে তো কেউ জোর করে নিয়ে যায় নি। দেখ না, কয়েকদিন পরে ঠিক ফিরে আসবে। গরিবদের সঙ্গে থেকে যখন দেখবে, তারা কি দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে তখন তার ভুল ভাঙবে। তবে যদি কিছুদিন থাকতে পারে, তা হলে নিজেকে ও সাধারণ মানুষের সমাজকে জানতে পারবে এবং কিছুটা সাবলম্বীও হবে। তুমি যেভাবে তাকে কচি খোকার মতো আগলে রেখেছিলে, তাতে করে সে কোনোদিন যেমন নিজেকে ও সাধারণ মানুষের সমাজকে জানতে পারত না তেমনি সাবলম্বীও হতে পারত না। তারপর স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বললেন, ধৈর্য ধর। পান্থ শুধু তোমার ছেলে নয়, আমারও। আমি লোক লাগিয়ে ঠিক তাকে খুঁজে বের করব। তা ছাড়া কয়েকদিন পর সে তো তার ঠিকানা জানাবে বলেছে।

তিস্তা এক্সপ্রেস যখন বেলা আড়াইটার সময় বাহাদুরাবাদ পৌঁছাল তখন যাত্রীদেরকে ব্যাগ এ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে নামতে দেখে পান্থ একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, এখানে সবাই নামছে কেন?

ভদ্রলোকটির নাম সহিদুল। পান্থর কথা শুনে বললেন, মনে হচ্ছে আপনি এ পথে আর কখনও যাতায়াত করেন নি? এই ট্রেন আর যাবে না। সামনে তিস্তা নদী। লঞ্চে করে নদী পার হতে হবে। ওপারে ফুলছড়ি ঘাটে অন্য ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। তাতে উঠতে হবে। তা আপনি যাবেন কোথায়?

পান্থ বলল, দিনাজপুর।

ভদ্রলোকটি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

পান্থ গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে লঞ্চে উঠল। লঞ্চে জাহেদা নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে পান্থর পরিচয় হল। তার কোলে একটা দু'বছরের ছেলে। জাহেদা টয়লেটে যাওয়ার সময় ছেলেটাকে পান্থর কাছে রেখে যান। ফিরে এসে কথায় কথায় দু'জনের পরিচয় ঘটে। জাহেদাদের বাড়ি ঘুঘুডাঙ্গায়। তিনি আই.এ. পাস। তার স্বামী

ঢাকায় চাকরি করেন। জাহেদা স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। ঈদ করার জন্য গ্রামের বাড়িতে যাছেন। ঈদের সময় যানবাহনে খুব ভীড় হয় বলে স্বামী স্ত্রী ও ছেলেকে এক সপ্তাহ আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঈদের ছুটিতে আসবেন। পান্থ দিনাজপুর বেড়াতে যাচ্ছে শুনে বললেন, ফেরার পথে আমাদের ঘুঘুডাঙ্গায় যাওয়ার অনুরোধ রইল। পার্বতীপুরে ট্রেন থেকে নেমে ঘুঘুডাঙ্গায় গিয়ে আমার স্বামীর নাম সারোয়ার বললেই সবাই আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

পান্থ বলল, ঠিক কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করব।

লঞ্চে উঠে সহিদুল অন্য জায়গায় বসে ছিলেন। লঞ্চ ফুলছড়ি ঘাটে এসে থামলে তিনি উঠে এসে পান্থকে সঙ্গে আসতে বললেন। জাহেদাও তাদের সাথে একসঙ্গে নামার জন্য ডেকে এল। লঞ্চের লোকেরা ডেক থেকে একটা বড় তক্তা ঘাটের পাড়ে ফেলে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা নামতে শুরু করল। ওরা তিনজন তক্তার কাছে এগিয়ে এল। জাহেদা আগে তক্তায় উঠে দু'তিন পা গেছে, আর পান্থ একটা পা শুধু তক্তায় দিয়েছে, এমন সময় সহিদুল পাড়ের মাটি ধসে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত স্বরে বললেন, আপনারা জলদি ফিরে আসুন। ততক্ষণে পান্থ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে জাহেদাকে দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তক্তা থেকে পা তুলে সরে এল। জাহেদা ভয় পেয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে কাঁপতে লাগল। ততক্ষণে পাড় ধসে তক্তাসহ নদীতে পড়ে গেছে। যারা তক্তায় ছিল তারাও পড়ে গেল। পাড়ের লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য দু'তিনটে নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর সব যাত্রী লঞ্চ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকায় চড়ে ঘাটে উঠল। মেয়েদের নৌকায় তোলার জন্য পুরুষেরা সাহায্য করল।

এদিকে ট্রেন তার নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে দিচ্ছিল দেখে আগের যাত্রীরা স্টেশন মাস্টারকে ও ট্রেনের গার্ডকে এবং ড্রাইভারকে দুর্ঘটনার কথা বলে অপেক্ষা করতে বলল।

ঘাটে উঠে জাহেদা পান্থকে বলল, আল্লাহ আপনার ভালো করবেন। আপনার জন্য আজ অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। আপনার এই উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। ফেরার পথে একদিনের জন্যে হলেও বোন মনে করে আমাদের বাড়িতে এলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

পান্থ বলল, ঠিক আছে, আসব।

জাহেদার সিট নাম্বার অন্য কামরায়, তাই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সহিদুল তাদের সাথেই ছিল। জাহেদা চলে যাওয়ার পর দু'জনে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে লাগল। তাদের দু'জনের সীট নাম্বার একই কামরায় কিছুটা দূরে দূরে। প্রথমে পান্থ বলল, আমরা তো খবরের কাগজের মাধ্যমে অনেকদিন আগে থেকে যমুনা সেতু হওয়ার কথা জেনে আসছি। সরকারের খুব তাড়াতাড়ি এটা বাস্তবায়ন করা উচিত। তা ছাড়া নদীর ভাঙ্গন রোধ করারও ব্যবস্থা করা উচিত। যেভাবে ভাঙ্গন চলছে, তাতে করে কত ঘরবাড়ি নষ্ট হচ্ছে।

সহিদুল বললেন, ঘরবাড়ি কি বলছেন, কত শত গ্রাম যে তিস্তা গ্রাস করেছে, কে তার হিসাব রাখে। সরকার নিজেদের গদি বাঁচানোর ধান্ধায় রয়েছে। এদিকে তাদের

লক্ষ্য রাখার সময় কোথায়? তারপর বললেন, দিনাজপুরে কোনো আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছেন নাকি?

পান্থ বলল, না এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি।

সহিদুল বললেন, বেড়াতে যখন বেরিয়েছেন তখন আমাদের ঝানজিরায় আসুন। খুব সুন্দর জায়গা। তারপর একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলেন।

ট্রেন যখন দিনাজপুর স্টেশনে পৌঁছল তখন রাত ন'টা। পান্থ ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠে বলল, একটা ভালো হোটেলে নিয়ে চল।

রিকশাওয়ালা কনিকা হোটেলে এনে বলল, এটাই এখানকার সেরা হোটেল।

পান্থ রিকশার ভাড়া মিটিয়ে অফিসে এসে একটা রুম চাইল।

হোটেলের ম্যানেজার পান্থর সঙ্গে কোনো কিছু নেই দেখে সাধারণ বোর্ডার মনে করলেন। বললেন, আমাদের এখানে রুম ভাড়া বেশি, আপনি অন্য হোটেলে যান।

পান্থ বলল, আমি এখানে নতুন এসেছি। এত রাতে কোথায় আবার খোঁজ করব। ভাড়া যাই হোক না কেন আমাকে রুম দিন।

ম্যানেজার খাতায় পান্থর নাম, বাবার নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা ও আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করে লিখলেন। তারপর খাতা ও কলম এগিয়ে দিয়ে আঙ্গুলী নির্দেশ করে সই করতে বলে বললেন, তার আগে ষাট টাকা দিন।

পান্থ টাকা দিয়ে সই করার সময় জিজ্ঞেস করল, এখানে খাবার ব্যবস্থা আছে?

সে যখন প্যান্টের পকেট থেকে একশ টাকার বাণ্ডিল বের করে টাকা দিচ্ছিল তখন ম্যানেজার দেখেছেন। ভাবলেন, ছেলেটাকে কথাটা বলা উচিত হয়নি। পান্থ খাবার কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। তারপর একটা বয়-এর হাতে চাবি দিয়ে বললেন, ওঁকে রুমে রেখে খাবার ব্যবস্থা করে দাও।

পরের দিন সকালে পান্থ মার্কেটে গিয়ে দুটো লুঙ্গি, একটা তোয়ালে, দুটো সাবান ও একটা কাপড়ের সাইড ব্যাগ কিনে রুমে ফিরে এল। তারপর গোসলের পর নাশতা খেয়ে সারাদিন কখনো হেঁটে, কখনো রিকশায় করে শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। জীবনে এই প্রথম একা একা খুব আনন্দ উপভোগ করল। পরের দিন হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে জিজ্ঞেস করল, এখানে দেখার মতো কি কি জিনিস আছে?

ম্যানেজার আলাপ করে বুঝেছেন, পান্থ ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে। বললেন, মহারাজার বাড়ি, রানী পুকুর ও আরও অনেক কিছু দেখার আছে। প্রায় চার মাইল দূরে রামসাগরও দেখবার মতো। সেখানে সপ্তাহে তিন দিন বাজার বসে। সাগরের পাড়ে ঈদগাঁ আছে। সীনসিনারিও দেখবার মতো। সেখানে পিকনিক করার জন্য অনেক দূর দূর থেকে লোকজন আসে। আপনি যদি বলেন, একটা ছেলে আপনার সাথে দিতে পারি। সে আপনাকে সব জায়গা দেখিয়ে আনবে।

পান্থ বলল, তা দেবেন। এখন শহরের আশপাশের গ্রামগুলোর নাম বলুন। আমি গ্রামেও বেড়াতে যাব।

ম্যানেজার একটা কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, আমি বলছি, আপনি লিখে নিন। ঝানজিরা, তরঙ্গিনী, ফুলবন, কালিকাপুর, সুন্দরবন, বীরগাঁও, চেরাডাঙ্গী এবং সদরপুর।

পান্থ ঠিকানা লেখার সময় ঝানজিরা নাম শুনে সহিদুলের কথা মনে পড়ল। আর গ্রামের নামগুলোর মধ্যে ফুলবন নামটা তার খুব পছন্দ হল। জিজ্ঞেস করল, ফুলবন ও ঝানজিরা এখান থেকে কতদূর?

ম্যানেজার বললেন, ফুলবন প্রায় চৌদ্দ মাইল হবে। আর ফুলবনের মাইল দুয়েক দূরে ঝানজিরা। ফুলবনের দক্ষিণে তরঙ্গিনী গ্রামটাও খুব সুন্দর। আর সদরপুর একটা আর্দশ গ্রাম। এখানে টেক্সটাইল মিল আছে।

পান্থ বলল, সম্ভব হলে আমি সব জায়গা ঘুরে দেখব। প্রথমে ফুলবন যেতে চাই। লোকেশান বলুন।

ম্যানেজার তাকে লোকেশান বুঝিয়ে দিলেন।

পান্থ আরও দু'দিন হোটেলে থেকে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখল। তারপর একদিন ফুলবন গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল। দিনাজপুর বাস টার্মিনালে এসে রংপুর সৈয়দপুরের বাসে করে রামডুবিতে নামল। এখানে বেশ কয়েকটা ধানের মিল আছে। পান্থ একটা মিলের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে কিভাবে ফুলবনে যাবে জিজ্ঞেস করল।

ম্যানেজার বললেন, ফুলবন এখান থেকে প্রায় তিন মাইল। আপনি রিকশা, ভ্যান বা গরুর গাড়িতে করে যেতে পারেন। কিসে যাবেন বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পান্থ ঢাকায় গরুর গাড়িতে ইট, বালু বইতে দেখেছে। তাতে যে মানুষও যায় তা জানে না। শুনে বেশ কৌতূহল বোধ করে বলল, গরুর গাড়িতে যাব।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন ও ছেলেমেয়েরা এখানে ধান ভাঙাতে আসে। সেদিন ফুলবন থেকে একটা ষোল-সতের বছরের ছেলে ধান ভাঙাতে এসেছিল। তার ধান ভাঙানও হয়ে গেছে। ম্যানেজার তাকে বললেন, তুই একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে এই সাহেবের সঙ্গে যা। ইনি তোদের গ্রামে যাবেন।

ছেলেটার নাম রোকন। সে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে পান্থসহ সেও চালের বস্তা নিয়ে গাড়িতে উঠল। রোকন প্রথমে গাড়িতে উঠতে চায়নি। বলল, আমি গাড়ির পাশে পাশে যাব। পান্থ জোর করে তাকে উঠিয়েছে। গ্রামের মেঠো এবড়োথেবড়ো রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনিতে পান্থর বেশ অসুবিধে হতে লাগল। তবু গরুর গাড়ি চড়ার আনন্দ ও গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে অসুবিধের কথা ভুলে গেল। এক সময় রোকনের কাছ থেকে তার পরিচয় ও গ্রামের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। প্রায় ঘন্টাখানেক যাওয়ার পর রোকন সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ যে দেখছেন গাছপালা, ঐটাই ফুলবন।

আরও কিছুটা আসার পর পান্থ গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়োয়ান গাড়ি থামালে পান্থ গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে রোকনকে বলল, তুমি যাও, আমি এইটুকু পথ হেঁটে যাব। তারপর গাড়োয়ানকে বলল, আপনি ওকে নিয়ে যান।

গাড়োয়ান বেশ অবাক হয়ে পান্থর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গাড়ি ছেড়ে দিল। আর রোকনও তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পান্থ ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। সে কোনোদিন বাস্তবে গ্রাম দেখেনি। সিনেমা বা টিভির পর্দায় দেখেছে। আজ বাস্তবে দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। সে

কোনোদিন হাঁটাহাঁটি করেনি। তার মাথার উপর সূর্যের কিরণ। হেঁটে যেতে বেশ কষ্ট হলেও অতি আনন্দে তা অনুভব করতে পারল না। ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে কিছুদূর আসার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে একটা পুকুরের পাড়ে বড় একটা নীম গাছ দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। গাছটার পাশে পুকুর ঘাট। সেখানে বেশ কয়েকজন লোক গোসল করছে। আর কয়েকটা আদলা ছেলে সাঁতার কেটে পুকুরের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। লোকগুলো তাদেরকে বকাবকি করছে। কিন্তু ছেলেগুলো তাদের কথায় কর্ণপাত করছে না। একপাশে কতকগুলো হাঁস একবার পানিতে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠছে। পান্থ বসে বসে এসব দেখে খুব আনন্দ পেতে লাগল।

এক সময় একজন বুড়োমতো লোক গোসল করে উঠে ঘরে যাওয়ার সময় পান্থকে নীম গাছতলায় বসে থাকতে দেখে পথিক মনে করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে? বাড়ি কোন্ গ্রামে?

এই বুড়োমতো লোকটার নাম নেয়ামত হোসেন। সবাই তাকে হোসেন মিয়া বলে ডাকে। আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। জায়গা-জমি যা আছে তাতে টেনেটুনে কোনো রকমে সংসার চলে যায়। লেখাপড়া অল্প স্বল্প জানেন। দুটো মেয়ে হয়ে মারা যাওয়ার পর একটা ছেলে হয়। তার নাম সাদেক। সাদেক কলেজে পড়তে পড়তে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা ফিরে এলেও সাদেক ফিরেনি। সবাই জানে সে যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে। কিন্তু হোসেন মিয়া একমাত্র ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভীষণ দুঃখ পাবেন ভেবে কেউ তাকে জানায়নি। তাই হোসেন মিয়ার বিশ্বাস, সাদেক একদিন-না-একদিন ফিরে আসবে। অনেক দিন হয়ে যেতেও যখন সাদেক ফিরে এল না তখন তিনি নিজেই লোকদের কাছে বলেন, আমার সাদেককে হয়তো আল্লাহ্পাক যুদ্ধ করার সময় দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। তা না হলে গ্রামের অন্য সব ছেলেরা ফিরে এল, সে এল না কেন? একমাত্র ছেলের শোকে হোসেন মিয়া বয়সের তুলনায় বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন।

হোসেন মিয়ার কথার উত্তরে পান্থ বলল, আমি ঢাকা থেকে এসেছি।

তা যাবেন কোথায়?

কোথায় যাব নির্দিষ্ট কিছু নেই। এই গ্রামে কিছুদিন থাকতে চাই। আমি গ্রাম কখনও দেখিনি। শহরে জন্ম, শহরেই মানুষ। এখানে থাকার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করবনে?

হোসেন মিয়া পথিকের কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি?

পান্থ নিজের নাম পাল্টে বলল, মানিক।

'আসুন-আমার সাথে' বলে হোসেন মিয়া হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

পান্থ তাকে অনুসরণ করে চলল। যে পুকুরে হোসেন মিয়া গোসল করতে এসেছিলেন, সেটা নিজেরই। অল্প দূরে দু'কামরা টিনশেড ঘর। পান্থ ঘরের কাছে এসে দেখতে পেল, ঘরের চারপাশে নানারকম গাছপালা। বেশ বড় উঠোন। একপাশে খড়ের

গাদা। সেখানে দুটো বলদ আর একটা গাভী বাঁধা। বলদ দুটো খড়ের গাদা থেকে খড় টেনে নিয়ে জাবর কাটছে। আর গাভীটা একটা গামলায় একবার করে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে আবার মুখ তুলে জিব দিয়ে নাক-মুখ পরিষ্কার করছে। তার বাছুরটা বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খেতে খেতে দুধের ওলানে ঢুস মারছে। এসব দেখে পান্থর খুব ভালো লাগল।

হোসেন মিয়া উঠানে এসে বেশ বড় গলায় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সাদেকের মা, দেখবে এস, আজ এমন একজন মেহমান এনেছি যা আগে কোনোদিন আনিনি।

হোসেন মিয়ার স্ত্রী জরিনা বিবি স্বামীর কথায় সাড়া না দিয়ে রান্নাঘরে তরকারীর হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে তানজিলাকে বললেন, যা তোর ফুপাকে নামায পড়তে বল। আমি ততক্ষণে এদিকে সব তৈরি করে রাখছি।

তানজিলা জরিনা বিবির ভাইঝি। ফাইফরমাশ শোনার জন্যে এনে রেখেছেন। দশ-বার বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। এ বছর সিক্সে উঠেছে। স্কুল বন্ধ থাকায় ঘরে আছে। সে বলল, ফুপা তোমাকে ডাকল, তুমি গেলে না যে?

জরিনা বিবি বললেন, তোর ফুপার কথা বাদ দে। রোজ তো গোসল করতে গিয়ে একজন করে মেহমান নিয়ে এসে খাওয়ায়।

হোসেন মিয়ার দুটো রুমের একটায় নিজেরা থাকেন। অন্যটায় আগে সাদেক থাকত। এখন তানজিলা পড়াশোনা করে। আর মেহমান কুটুম এলে থাকে। হোসেন মিয়া মানিককে সেই রুমে নিয়ে এসে বললেন, আপনি বসুন আমি পাশের রুমে থেকে নামায পড়ে আসি। কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন।

তানজিলা ফুপাকে ফুপুর কথা বলতে এসেছিল। তাকে দেখে বলল, ফুপু আপনাকে নামায পড়ে নিতে বলল।

হোসেন মিয়া বললেন, আমি নামায পড়ে নিচ্ছি, তুই গিয়ে তোর ফুপিকে ভাত বাড়তে বল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তিনি প্রতিদিন গোসল করে আসার সময় একজন ফকির সঙ্গে করে নিয়ে এসে একসাথে ভাত খান। খাওয়ার পর ফকিরকে বলেন, আমার সাদেক যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে সেই দো'য়া করবে। নামায শেষ করে হোসেন মিয়া রান্নাঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, আজ কিন্তু কোনো ফকির-মিস্কিন আনিনি। ঢাকার একটা সুন্দর ছেলেকে নিয়ে এসেছি। দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের ছেলে। তারপর তরকারীর বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, সে কি এসব দিয়ে ভাত খেতে পারবে? এ বেলা অন্তত একটা ডিম ভেজে দাও। রাতের জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা করো।

জরিনা বিবি বেশ অবাক হয়ে বললেন, ছেলেটা রাতেও এখানে খাবে নাকি?

হোসেন মিয়া বললেন, শুধু খাবে না, থাকবেও। ছেলেটা গ্রাম কখনও দেখেনি। নতুন এসেছে। কোথায় খাবে, থাকবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ভাবছি, যে ক'দিন থাকে আমাদের কাছে থাকতে বলব।

জরিনা বিবি আরো অবাক হয়ে বললেন, সে কি! কোথাকার কে, জানা নেই শোনা নেই, তাকে রাখা কি ঠিক হবে? রাতে যদি চুরি করে পালিয়ে যায়?

হোসেন মিয়া বললেন, কি যা-তা বলছ। চোর-টোর হলে আমি কি বুঝতে পারতাম না। এত বয়স হল, ভালো মন্দ চেনার জ্ঞান আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। তোমাকে ঐসব ভাবতে হবে না। ডিম ভেজে তানজিলার হাতে সব কিছু পাঠিয়ে দাও। আর তুমিও দরজার আড়াল থেকে ছেলেটাকে দেখ; যা বললাম তা সত্য কিনা। আমি তার কাছে যাচ্ছি বলে তিনি চলে গেলেন।

রুমে এসে হোসেন মিয়া মানিককে বললেন, আপনি যে কয়দিন গ্রামে থাকতে চান আমাদের বাড়িতেই থাকুন। অচেনা জায়গায় কোথায় থাকবেন, খাবেন? অনেক অসুবিধেয় পড়তে পারেন।

মানিক মনে মনে খুশি হয়ে বলল, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো?

এমন সময় তানজিলাকে ভাত নিয়ে আসতে দেখে হোসেন মিয়া বললেন, আগে খেয়ে নিই আসুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। তারপর কথা বলা যাবে।

তানজিলাকে দেখে মানিক বলল, বাহ্! বেশ সুন্দর মেয়ে তো! আপনার মেয়ে নাকি? তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

তানজিলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। মানিকের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে কিছু বলতে পারল না। গুটিশুটি মেরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

হোসেন মিয়া বললেন, ও আমার শালার মেয়ে তানজিলা। আমার কোনো মেয়ে বেঁচে নেই। আল্লাহ্ একটা ছেলে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে আজও ফিরে আসেনি। আল্লাহকেই মালুম, আর সে ফিরে আসবে কিনা। কথা বলতে বলতে তার গলা ধরে এল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে চোখ মুছে তানজিলাকে বললেন, তুই এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন? এনার সব কিছু তোকেই তো করতে হবে। দে, ভাত দে।

মানিক বুঝতে পারল, উনি ছেলের শোকে অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে গেছেন। বলল, না না, ও ছেলেমানুষ পারবে না। আমরা নিজেরা নিয়ে খাই, আসুন।

হোসেন মিয়া খেতে খেতে বললেন, আমাদের অসুবিধের কথা বলছিলেন, অসুবিধে কিসের? বরং খুশি হব। আমার সাদেক আপনার চেয়ে বড় হলেও আপনাকে দেখে তার কথা বেশি করে মনে পড়ছে। কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটো আবার পানিতে ভরে উঠল। বাঁ হাতের উলটো পিঠে চোখ মুছে বললেন, এখানে আপনার অসুবিধে হলে না হয় মেম্বার সাহেবের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।

মানিক হোসেন মিয়ার দুঃখ বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, আপনারা খুশি হলে এখানে থাকতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে। আমাকে আপনার সাদেকের মতো মনে করবেন, আর তুমি করে বলবেন। ছেলেকে কি কেউ আপনি করে বলে?

হোসেন মিয়া খুশি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে বললেন, তাই হবে বাবা। তোমাকে আমরা সাদেকের মতো মনে করব।

জরিনা বিবি এতক্ষণ দরজার আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিলেন, ওনারও চোখে পানি এসে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ মুছতে মুছতে চলে যাওয়ার সময় ভাবলেন, ওনার কথাই ঠিক, ছেলেটা সত্যিই ভালো।

খাওয়া শেষ হয়ে যেতে তানজিলা থালা বাসন নিয়ে চলে যাওয়ার পর হোসেন মিয়া মানিককে বললেন, তুমি এখানে বিশ্রাম নাও। এটা সাদেকের ঘর। আমি একটু পরে মাঠের দিকে যাব। কিছু দরকার হলে তানজিলাকে বলো। এই কথা বলে তিনি বেরিয়ে নিজের রুমে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সাদেকের কথা ভাবতে লাগলেন। সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বেঁচে থাকলে এতদিনে নিশ্চয় ফিরে আসত। তা না হলে গ্রামের এত ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে ফিরে এল, সে এল না কেন? আল্লাহকে জানাল, "আল্লাহ্ গো, তুমি যদি তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে থাক, তা হলে তাকে বেহেশত নসিব করো। তার কবরের আজাব মাফ করে দিও।"

জরিনা বিবি খেয়ে উঠে তানজিলাকে ঝুঁটো থালা বাসন মাঝতে বলে ঘরে এসে দেখলেন, স্বামী শুয়ে রয়েছে; আর তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। বললেন, কেঁদে আর কি করবে? কাঁদলে কি আর সাদেক ফিরে আসবে? তারপর নিজেও চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। চোখ মুছে দুটো পান বানিয়ে একটা স্বামীর হাতে দিয়ে অন্যটা নিজের মুখে দিলেন।

হোসেন মিয়া বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। তারপর উঠে বসে চোখ মুছে পান মুখে দিয়ে বললেন, মাঠের দিকে যাই, দেখি কামলারা কি করছে।

জরিনা বিবি বললেন, ছেলেটা ক'দিন থাকবে কিছু জিজ্ঞেস করেছ?

না, করিনি।

সে নিজে কিছু বলেছে?

না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, গ্রাম কখনও দেখেনি, তাই গ্রাম দেখতে এসেছে।

ছেলেটার নাম কি?

মানিক।

বেশ সুন্দর নাম তো! দেখতেও বেশ সুন্দর।

হ্যাঁ, তাই তো থাকতে বললাম।

বলে ভালোই করেছ। সাদেক চলে যাওয়ার পর ঘরটা একদম ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সাদেকের আমার রাশ ভারী ছিল। ঘরে থাকলে মনে হত, যেন কত লোক রয়েছে। ছেলেটা যতদিন থাকবে ততদিন তবু ঘরটা গুলজার থাকবে।

হোসেন মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি মাঠে যাচ্ছি। ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। কিছু লাগলে তানজিলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

মানিক কয়েকদিন হল এখানে রয়েছে। সে তানজিলাকে সকালে ও সন্ধ্যায় পড়ায়। তানজিলা তাকে ভাইয়া বলে ডাকে। জরিনা বিবি গাঁয়ের মেয়ে। তাই মানিককে ছেলের মতো মনে করলেও তার সামনে যান নি। এমন কি খাওয়ার সময়ও না। উনি সব কিছু তানজিলার হাতে পাঠিয়ে দিয়ে দরজার আড়াল থেকে দেখেন।

মানিক এর মধ্যে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকের সাথে পরিচয় করেছে। গ্রামের লোকজন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলে, হোসেন মিয়া আমার দূর সম্পর্কের চাচা। এতদিন আমি বিদেশে ছিলাম। উনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাই চাচার কাছে এসে উঠেছি।

ফুলবন গ্রামের রহিম মেম্বার বেশ নামকরা লোক। ধনী না হলেও বেশ সচ্ছল অবস্থা। খুব সৎ ও ধার্মিক হিসাবে নিজেদের ও আশপাশের গ্রামে সুনাম আছে। ওঁর চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে সালেক বড়। ছোটরা লেখাপড়া করছে। সালেক বিয়ে পাস করে কৃষি খামার করেছে। সেখানে উন্নত ধরণের চাষাবাদ করে। সেই সঙ্গে সমাজকল্যাণের কাজও করে। বাবার মতো তার আখলাক। গরিবদের উপকার করাকে কর্তব্য জ্ঞান করে। তাদের ছেলেমেয়েরা কি করে লেখাপড়া করবে, সেদিকে তার খুব লক্ষ্য। ইতিমধ্যে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামের লোকেদের সাহায্য ও সহযোগীতায় এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছে, যেখানে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে একটা বড় মাদ্রাসা ছিল। পাশের গ্রাম ঝানজিরায় আর একটা বড় মাদ্রাসা হওয়ার পর ফুলবনের মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ পাশাপাশি গ্রামে দুটো বড় মাদ্রাসা পরিচালনা করা গ্রামের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঝানজিরা গ্রামের ধনীরা এই মাদ্রাসায় সিংহভাগ খরচ দিতেন। তারা যখন নিজেদের গ্রামে মাদ্রাসা করলেন তখন ফুলবনের মাদ্রাসায় সাহায্য বন্ধ করে দেন। তাই ফুলবনের লোকেরা বড় মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছে।

মানিক একদিন ঝানজিরা গ্রাম ঘুরে দেখার সময় সহিদুলের খোঁজ করল। সহিদুল ঘরেই ছিলেন। তাকে কয়েকদিন থাকতে বললেন, কিন্তু মানিক রাজি হল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফেরার সময় আবার আসবার কথা বলে ফিরে এল। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকজনদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারল, চাষের মৌসুম ছাড়া সারা বছর গরিব লোকেরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করে। বয়স্ক ছেলেরা কাজ না পেয়ে আড্ডা দেয়। চুরি-চামারি করে। তবে সবখানে রহিম মেম্বার ও তার ছেলে সালেকের সুনাম শুনল। তাই একদিন সে সালেকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশিরভাগ সময় তার সঙ্গে থাকে। তাকে নানান কাজে সাহায্য করে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একে অপরকে জানতে পারে এবং দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

ফুলবন গ্রামের অল্প দূরে আতরাই ও ফঁকাড়া নদীর মাঝখানে চরে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে দুটো গ্রাম। একটার নাম সাইতরা ও অপরটির নাম পুরুসতুমা। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর। লোকগুলোও খুব সরল এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী। একদিন দু'বন্ধুতে ঐ দ্বীপে বসে গল্প করতে করতে সালেক মানিককে বলল, আমাদের এতদিন বন্ধুত্ব হল, কিন্তু তোমার পরিচয় জানতে পারলাম না। তোমাকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে করে তুমি সবার কাছে যা পরিচয় দিয়েছ তা আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হয়, তুমি কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছ।

মানিক বলল, জানতাম সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও তোমার কাছে একদিন-না একদিন ধরা পড়বই। তুমি না বললেও আমি তোমাকে দু'একদিনের মধ্যে আমার সব কথা বলতাম। তার আগেই যখন তুমি বলে ফেললে তখন আর বলতে কোনো বাধা নেই। তবে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে, যা শুনবে তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সালেক তার হাতে হাত রেখে বলল, বেশ, আমি ওয়াদা করলাম। এবার বল।

মানিক তার আসল পরিচয় এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য বলল।

সালেক সব শুনে খুব অবাক হয়ে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

মানিক তাকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

সালেক তাকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে বলল, কি করে বিশ্বাস করব বলুন? এতবড় ধনী ঘরের উচ্চশিক্ষিত একমাত্র সন্তান হয়ে সাধারণ মানুষের উপকার করার জন্য এত কষ্টের জীবন বেছে নিলেন? আপনার মতো ছেলে যদি আমাদের দেশে আরও কয়েকটা জন্মাত, তা হলে দেশের অনেক উপকার হত।

মানিক তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে বলল, আমাকে আপনি করে বলছ কেন? বন্ধু বন্ধুকে কেউ আপনি করে বলে না কি?

সালেক বলল, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। সম্মানীয়কে সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিত? তা না হলে শিক্ষাকে অবমাননা করা হবে। এতদিন আপনার পরিচয় না জেনে অন্যায় করেছি। মাফ করে দিন।

মানিক বলল, সালেক তুমি ভুল করছ। বন্ধু যত সম্মানীয় হোক না কেন, বন্ধু বন্ধুই। তার সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করা উচিত। যা উচিত তা মেনে নিতে পারছ না কেন? তা ছাড়া এখানকার কয়েকটা গ্রাম তো ঘুরে দেখলাম। সবখানেই তোমার ও তোমার বাবার গুণাগুণ শুনলাম। আর আমিও নিজের চোখে ও কানে তার প্রমাণ পেলাম। তা হলে তুমিও তো আমার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানীয়।

সালেক লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি কি প্রমাণ পেয়েছ জানি না, আমার তো মনে হয় আমি গরিবদের কোনো উপকারই করতে পারছি না।

মানিক বলল, তোমার সাধ্যমতো যা করেছ তা যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। এবার শোন, আমি এখানে কয়েকটা প্রকল্প করতে চাই। যেমন, হাঁস-মুরগির ফার্ম, দুধ উৎপাদনের ফার্ম এবং কৃষি খামার। তুমি তো কৃষি খামার করেছ। আমি আরো বৃহৎ আকারে করতে চাই। এতে করে গ্রামের সাধারণ মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হবে তেমনি দেশের মানুষের চাহিদাও কিছুটা পূরণ হবে।

সে তো বিরাট ব্যাপার। এতকিছু করার জন্য অনেক জায়গা-জমির দরকার। গ্রামের লোক কি এত জায়গা-জমি এমনি দেবে? সবকিছু কিনতে হবে। তারপর এতসব করতে গেলে কয়েক লাখ টাকা লাগবে।

টাকার জন্য কিছু চিন্তা করো না। সে দায়িত্ব আমার। তুমি শুধু গ্রামের কয়েকজন ভালো লোক জোগাড় কর। আর সে রকম জায়গা-জমির খোঁজ কর।

এত বড় কাজে হাত দিতে সাহস হচ্ছে না। যদি আমরা লাভবান হতে না পারি? তা হলে তোমার কত টাকা নষ্ট হবে, সে চিন্তা করেছ?

যত টাকাই নষ্ট হোক, যা বললাম তা আমি করবই। আমরা লাভবান হওয়ার জন্য এসব করছি না। করছি, দেশের মানুষের উপকারের জন্য। তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? মনে সাহস রাখ। যারা স্বার্থান্বেষী তারা কাপুরুষ। আর কাপুরুষই সব কিছুতে ভয় পায়।

তুমি ঠিক কথা বলেছ। আচ্ছা, আমার আব্বাকে জানাতে তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকবে কেন? তবে চিন্তা করছি, ওঁকে জানালে আমার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এখন না হলেও একদিন-না-একদিন তো হবেই।

মানিক দৃঢ় স্বরে বলল, না। কোনোদিন যেন তা না হয়, সেরকম ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

লোকে জানতে চাইবে, এত টাকা আমরা পেলাম কোথায়, তখন কি বলব?

এটা অবশ্য ঠিক কথা। কিন্তু আমি সকলের কাছ থেকে আড়ালে থাকতে চাই। আমাকে সবার কাছে খামারের একজন কর্মী হিসাবে পরিচয় দেবে। আর টাকা-পয়সার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, ঢাকার একজন লোক টাকা ইনভেষ্ট করছে।

তা হলে আমি একটা কথা বলি, আব্বাকে সবকিছুর দায়িত্ব দিয়ে দিই। আমার মনে হয়, তাকে তুমি যদি তোমার সব কথা খুলে বলে দায়িত্ব নেয়ার কথা বল, তা হলে রাজি হতে পারে। আর আব্বাই পারবে তোমাকে আড়ালে রাখতে।

কথাটা মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। ভেবে-চিন্তে কাল সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়ি যাব। এবার ফিরি, চল।

ফুলবন গ্রামে আর একজন সৎলোক আছেন। তিনি নিয়াজ মাতব্বর। বিত্তবান লোক। তার একমাত্র ছেলে আনোয়ার হোসেন। তিনি ঢাকায় ব্যবসা করে গাড়ি-বাড়ি করেছেন। বহ্নি ও ইভা ওনারই মেয়ে। নিয়াজ মাতব্বর মাঝে মাঝে ঢাকায় ছেলের কাছে যান। আনোয়ার সাহেবও বছরে দু'তিনবার স্বপরিবারে গ্রামের বাড়িতে আসেন। নিয়াজ মাতব্বর বিয়ের ছয়-সাত বছর পর যখন তাদের কোনো সন্তানাদি হল না তখন তার এক ভাইঝিকে পালতে নেন। তার নাম আনসুরা। আনসুরাকে পালতে নেয়ার দু'বছর পর আনোয়ার সাহেব জন্মান। আনসুরাকে মানুষ করে নিয়াজ মাতব্বর বিয়ে দিয়েছিলেন। আনসুরা বন্ধ্যা মেয়ে। পৌঢ়া বয়সে বিধবা হয়ে নিয়াজ মাতব্বরের কাছে আছেন। তিনিই তার সংসারের কাজকর্ম ও তাদেরকে দেখাশোনা করেন। ওনার বাড়িটা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে।

যেদিন মানিক সালেকের সঙ্গে ঐসব কথাবার্তা বলল তার পরের দিন সকালে হোসেন মিয়া বাজারে গিয়ে বাজার করে ফেরার সময় কাদেরের চা-এর দোকানে চা খেতে ঢুকলেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে বললেন, কাদের ভাই, এক কাপ চা দাও।

নিয়াজ মাতব্বর প্রতিদিন বাজারে এসে এখানে চা খান। আজ এসে হোসেন মিয়াকে দেখে বললেন, কি হোসেন মিয়া, বিদেশ থেকে তোমার ভাইপো নাকি এসেছে? আমি তো জানি তোমার কোনো ভাই নেই। ভাইপো এল কোথা থেকে?

হোসেন মিয়া বললেন, ভাই না থাকলে তো কি হয়েছে, ভাইপো আল্লাহ দিয়েছেন।

নিয়াজ মাতব্বর আবার বললেন, শুনলাম ছেলেটা না কি অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করে এনেছে। তা সে সব তোমার হাতে দিয়েছে তো?

হোসেন মিয়া বললেন, তার টাকা আমি নেব কেন? আল্লাহ কি আমাকে কম দিয়েছেন। যা দিয়েছেন তাতে তাঁর দরবারে হাজারবার শুকরিয়া জানাই। ওকে পেয়ে আমরা যে সাদেকের শোক অনেকটা ভুলতে পেরেছি সেটাই আমাদের অনেক পাওয়া।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, তা হলে তো খুব ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম। কিন্তু কতদিন থাকবে সেটা কি ভেবে দেখেছ?

হোসেন মিয়া বললেন, ভেবে আর কি করব? আল্লাহ যতদিন তকদিরে রেখেছেন ততদিন থাকবে। তা আপনি কেমন আছেন মাতব্বর সাহেব?

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, আল্লাহ পাকের শোকর করি; তিনি আমাকে বেশ ভালোই রেখেছেন। আমার কথায় মনে কষ্ট নিও না। মনে হল তাই বললাম।

ততক্ষণে হোসেন মিয়ার চা খাওয়া হয়ে গেছে। কাপটা রেখে চায়ের দাম দিয়ে বললেন, মনে কষ্ট নেব কেন? আপন লোক ভেবেই তো বললেন। তারপর সালাম বিনিময় করে বেরিয়ে এলেন।

মানিক সকালে বাজারে গিয়ে দু'কেজি খাসির গোস্ত ও বেশ কিছু কাঁচা আনাজ কিনে এনেছে। সে প্রায় দু'একদিন ছাড়া বাজার করে নিয়ে আসে। আর বাজারের পরিমাণও বেশি থাকে। প্রথম যেদিন বাজার করে নিয়ে আসে সেদিন হোসেন মিয়া তাকে বলেছিলেন, তুমি আবার বাজার করতে গেলে কেন? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়েই তো বেশ চলে যাচ্ছে। তখন মানিক বলেছিল, আমার বাজার করার সামর্থ্য আছে, তাই করেছি। ছেলের কি উচিত না, মা-বাবাকে সাহায্য করা?

হোসেন মিয়া বললেন, তুমি তো আর রোজগার করছ না যে, তোমার কাছে টাকা পয়সা থাকবে।

মানিক বলল, রোজগার না করলেও আমার টাকা-পয়সা আছে। যতদিন থাকবে করব, না থাকলে করব না। নিষেধ করলে ভাবব, আমাকে ছেলে বলে মনে করেন না।

এরপর হোসেন মিয়া তাকে আর বাজার করতে নিষেধ করেন না।

প্রতি শুক্রবার হোসেন মিয়া মরহুম মা-বাবার রুহের মাগফেরাতের জন্য দু'তিনজন মিসকীন খাওয়ান। তাই তিনি সকালে বাজার করতে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে একটা অসুস্থ কামলাকে দেখতে গিয়ে দেরি করে ফেলেন। নচেৎ বাজারে

মানিকের সাথে দেখা হয়ে যেত। বাজার করে যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন জরিনা বিবি বঁটিতে গোস্ত কাটছিলেন।

স্বামীকে বাজার নিয়ে আসতে দেখে বললেন, তুমি আবার এসব আনতে গেলে কেন? মানিক তো এনেছে।

হোসেন মিয়া বললেন, তাতে কি হয়েছে? মানিক গোস্ত এনেছে; আর আমি এনেছি মাছ। আজ মিসকীন খাওয়াতে হবে না?

জরিনা বিবি বললেন, তাই তো? আমার সে কথা খেয়ালই ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যের পর মানিক সালেকের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। সালেক মাগরিবের নামায পড়ে তারই অপেক্ষা করছিল। কাছে এলে সালাম দিয়ে বলল, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

মানিক আগে কখনও কাউকে সালাম দেয়নি এবং তাকেও কেউ দেয়নি। তাদের উচ্চ সমাজে এসব প্রচলন নেই বললেই চলে। গ্রামে এসে একে অপরকে সালাম দিতে শুনে কিছুটা রপ্ত করেছে। কিন্তু কাউকে সালাম দেয়নি। কেউ দিলে উত্তর দেয়। তবে শুদ্ধ করে বলতে পারে না। তাই এখন সালেকের সালামের প্রতি-উত্তরে বলল, ওয়ালেকুম সালাম।

সালেক মৃদু হেসে বলল, মানিক ভাই, তোমাকে দু'একটা কথা বলব কিছু মনে করবে না তো?

মানিক বলল, বল কি বলবে, কিছু মনে করব কেন?

সালেক বলল, তুমি উচ্চ সমাজে মানুষ। মনে হয় ঐ সমাজে সালাম বিনিময়ের রেওয়াজ নেই। তাই তুমি যেমন প্রথমে কাউকে সালাম দাওনি তেমনি কেউ সালাম দিলে তার উত্তরও সঠিক ভাবে দিতে পার না। অবশ্য আজকাল প্রায় বেশিরভাগ লোক সালাম বিনিময় করার সময় সঠিক উচ্চারণ করে না। আবার অনেকে সালামের প্রতি-উত্তরে শুধু ওয়ালেকুম বা মুখে কিছু না বলে শুধু একটু মাথা নাড়ে। অথবা একটা হাত একটু উপরে তুলে। আরও দেখা যায়, যখন কোনো গরিব লোক কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সালাম দেয় তখন গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ঐভাবে উত্তর দেয়। এর কারণ দুটো। একটা অজ্ঞতা আর অন্যটা হল অহঙ্কার। আবার অনেকে সালাম বিনিময়ের সময় ডান হাত কপাল পর্যন্ত উঠায়। এটা যে একটা বেদাৎ, তা তারা জানে না। অথচ অজ্ঞতা ও অহঙ্কার ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঘণ্যতর অপরাধ। এই দুটো জিনিস যে সমাজের জন্য খুব ক্ষতিকর, তা ইসলাম যেমন বলে তেমনি পৃথিবীর সকল মনীষীরা বলেছেন। ইসলামে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। আর সালাম হল, দেখা হলে এক ভাই অন্য ভাইয়ের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সুখ-শান্তি প্রার্থনা করা। সেখানে ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, চাকর-মনিবের কোনো ভেদাভেদ নেই। অনুরূপভাবে নামাযের সময়ও কোনো ভেদাভেদ নেই। শুধু গরিব ও নীচু শ্রেণীর মানুষ নামায পড়বে আর ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষ পড়বে না, এটাও ইসলামে নেই। আল্লাহর কাছে গরিব-ধনী, উচ্চ-নীচের কোনো মূল্য নেই। তাঁর কাছে সব মানুষ সমান। তাঁর আইন-কানুনও সব মানুষের জন্য সমান। মানুষের মধ্যে যারা সঠিক ভাবে নামায আদায় করতে পারে, যারা সৎ চরিত্রের

অধিকারী এবং যারা মানুষের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, তারাই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তাদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। সেজন্যে তাদেরকে পরকালে জান্নাত দান করবেন। এগুলো কুরআন পাকের কথা। পরে সময়মতো এ ব্যাপারে আরও আলোচনা করব। এখন সালাম ও তার উত্তর বলছি শোন, সালাম হবে- "আসসালামু আ'লায়কুম।" তার উত্তর হবে-"ওয়া আলাকুম আসসালাম।" এবার আমি একজন মুসলমান ও বন্ধু হিসাব তোমাকে নামায পড়ার জন্য অনুরোধ করব। কারণ, বলাটা আমার জন্য ফরয। মানা-না-মানা তোমার খুশি। তবে একটা কথা মনে রেখ, ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। ধর্ম হল নিজস্ব ব্যাপার। তাই বলে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে অধর্মের কাজ করতে দেখলে কিছু বলতে পারবে না, এটা ঠিক নয়। বরং বলাটাই তার অবশ্য কর্তব্য। না বললে কাল হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর ধর্মের অনুশীলন যা কিছু করবে তা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে এবং সবকিছু কায়মনবাক্যে করতে হবে। লোক দেখান বা নিজেকে উচ্চমর্যাদায় প্রতিপন্ন করার জন্য যদি কেউ ইবাদত করে, তা হলে তা তিনি গ্রহণ করেন না। তবে তাকে ইবাদতের ফলাফল দুনিয়াতে দিয়ে দেন। দুনিয়ার কামনা-বাসনা তার পূরণ হয়। কিন্তু আখেরাতে সে কিছুই পাবে না; পাবে জাহান্নাম। যারা প্রকৃত মুসলমান তারা নিজের এবং দুনিয়ার কোনো মতবাদ না মেনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) মতবাদে চলেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) মতবাদ যে কত নিখুঁত ও নির্ভুল তা যেমন কুরআন পাকে বর্ণিত আছে তেমনি পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী-গুণীজনেরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তুমি হয়তো জান না, ইসলামের ছোট-বড় যে কোনো আইন মানব জাতির জন্য যে কত কল্যাণকর ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত তা মানুষ যদি জানত, তা হলে তারা নিজেদের বা অন্য কোনো মানুষের মতবাদে পরিচালিত হত না। আসলে কয়জন ইসলামের এসব তত্ত্ব জানে? যদিও কিছু কিছু লোক জানে, তারাও আবার শ্রেণীভাগ হয়ে গেছে। একদল নিজেরা সবকিছু মেনে চলে অন্যকেও চালাবার চেষ্টা করেন। আর একদল নিজেদের স্বার্থের জন্য জেনেও সেই মতো চলে না। এরাই মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে।

এমন সময় রহিম মেম্বারকে আসতে দেখে মানিক বলল, তোমার সাথে এসব ব্যাপারে পরে আলোচনা করব। এখন চুপ কর, তোমার বাবা আসছেন।

কাছে এসে রহিম মেম্বার সালাম দিয়ে বললেন, মানিক যে, কেমন আছ?

সালেকের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পরে মানিক বেশ কয়েকবার তাদের বাড়িতে এসেছে। রহিম মেম্বারের সাথেও পরিচয় হয়েছে। মানিক সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভালো আছি চাচা। আপনি কেমন আছেন?

রহিম মেম্বার বললেন, আল্লাহ যে অবস্থায় রেখেছেন, তাতে তাঁর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাই।

সালেক বলল, আব্বা, তোমার সঙ্গে মানিক কিছু পরামর্শ করার জন্য এসেছে।

রহিম মেম্বার বললেন, বেশ তো করবে। তোমরা বস, আমি আসছি বলে ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

মানিক সালেককে বলল, চাচাকে তুমি আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা বলবে।

সালেক বলল, ঠিক আছে, তাই বলব।

কিছুক্ষণ পর রহিম মেম্বার ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসে মানিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার বল কি পরামর্শ চাও?

মানিক সালেকের দিকে তাকাতে সে বলল, আব্বা, মানিকের হয়ে আমি বলছি। তারপর সে মানিকের আসল পরিচয় বলে তার প্ল্যান-প্রোগ্রামের এবং টাকা-পয়সার কথা বলল। আব্বাকে অবাক হতে দেখে সালেক আবার বলল, মানিক চায়, তোমার উপর সবকিছুর দায়িত্ব দিতে। সবাই জানবে তুমিই এসব করছ। আমি ও মানিক তোমাকে সাহায্য করছি।

রহিম মেম্বার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, মানিকের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু এতে যদি আমরা সাকসেসফুল হতে না পারি, তা হলে তার বহু টাকা লস হবে। তা ছাড়া কাজটাও খুব রিস্কী।

সালেক বলল, আমিও সে কথা মানিককে বলেছিলাম। কিন্তু ও বলল, টাকা-পয়সা নষ্ট হবে কেন? আমরা যদি সৎলোকদের নিয়ে কাজ শুরু করি, তা হলে নিশ্চয় সাকসেসফুল হব। আর লাভ না হয় নাই হবে। তবুও তো গ্রামের বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। দেশেরও অনেক উপকার হবে। আমাদের লাভের দরকার নেই।

রহিম মেম্বার বললেন, তবু এসব কাজ আগপিছু ভেবে করা উচিত।

মানিক বলল, চাচা, আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শহর ছেড়ে এসেছি। আর টাকা-পয়সার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। সে দায়িত্ব আমার। আপনি যত শিগগিরই পারেন কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করুন।

রহিম মেম্বার আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, বেশ, তুমি যখন আমাকে এত বিশ্বাস কর, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি দায়-দায়িত্ব নিলাম। এখন তোমরা শোন, সবকিছু একটা এরিয়ার মধ্যে হলে ভালো হয়। আমি ভাবছি, আমার বাগান বাড়ির পাশে যে কয়েক বিঘে ডাঙ্গা জমি আছে, প্রথমে সেখানে মুরগির ও দুধের ফার্মের কাজ শুরু করা যাক। তারপর কৃষি ফার্মের জন্য আমাদের ডাঙ্গার পাশে নিয়াজ মাতব্বরের বেশ কিছু ধানি জমি আছে, সেটা অ্যাকোয়ার করার চেষ্টা করতে হবে। আর ওঁর জমির পাশে যে বড় পুকুরটা রয়েছে, সেটাও নেয়ার ব্যবস্থা করে মাছের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু নিয়াজ মাতব্বর রাজি হবেন কিনা সন্দেহ আছে।

মানিক বলল, এ ব্যাপারে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই।

রহিম মেম্বার বললেন, নিশ্চয় বলবে। কি বলতে চাও বল?

মানিক বলল, প্রথমে আমি আপনার জায়গা কিনে নিয়ে কাজ শুরু করতে চাই। পরবর্তীতে আমরা নিয়াজ মাতব্বরকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলে জমি ও পুকুর কেনার প্রস্তাব দেব। রাজি না হলে, ন্যায্য দামের চেয়ে বেশি দিয়ে কেনার চেষ্টা করব। আশা করি, আমাদের কাজকর্ম দেখে উনি রাজি হবেন। একান্ত যদি না হন, তখন আমরা অন্য চেষ্টা করব।

রহিম মেম্বার বললেন, কথাটা মন্দ বলনি। তবে আমার ডাঙ্গা জমির দাম পরে দিও। সেই টাকায় আপাতত কাজ শুরু করা যাবে।

মানিক বলল, না চাচা, তা হয় না। একটু আগে তো বললাম, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি ঐ টাকা দিয়ে ফসলি জমি কিনুন। তাতে আমি মনে শান্তি পাব।

রহিম মেম্বার মানিকের সাথে যত কথা বলছেন ততই তার মনের উদারতার কথা বুঝতে পেরে যেমন অবাক হচ্ছেন তেমনি তাকে দেশের রত্ন ভেবে আনন্দে ও গর্বে বুকটা ফুলে উঠছে। বললেন, বেশ তাই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে জমি রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর এরিয়াটা ঘেরার কাজ শুরু হয়ে গেল। তারপর চার-পাঁচ মাসের মধ্যে অর্ধেক জায়গায় মুরগির ফার্ম এবং বাকি অর্ধেকে গরুর দুধের ফার্ম করা হল। এতে করে গ্রামের বহু লোকের কর্মসংস্থান হল।

এই কয়েক মাসে সালেক ও তার বাবার সংস্পর্শে এসে মানিকের মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সালেকের সঙ্গে মাঝে মাঝে কুরআন, হাদিস ও ইসলাম সম্বন্ধে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা করেছে। ঐসবে কি আছে জানার জন্য সালেকের কাছ থেকে ইসলামিক বই চেয়ে নিয়ে পড়াশোনা করেছে। নিজেও ঢাকা থেকে অনেক বই কিনে এনে পড়েছে। শেষে নিজের অজ্ঞানতার কথা চিন্তা করে লজ্জা পেয়ে ইসলামের আইন অনুশীলন করছে, নিয়মিত নামায পড়ছে, দাড়িও রেখেছে। দাড়ি রাখাতে মানিককে আরো সুন্দর দেখায়।

একদিন সালেক তাকে বলেই ফেলল, দাড়ি রাখাতে তোমার সৌন্দর্য যেমন আরো বেশি ফুটে উঠেছে তেমিন জানাশোনা কেউ দেখলে তোমাকে চিনতে পারবে না।

মানিক দাড়ি রাখার পর নিজেকে আয়নায় দেখে সে কথা আগেই বুঝেছে। তাই সালেকের কথা শুনে সে শুধু বলল, তাই নাকি।

সালেক বলল, সত্যিই তাই।

একদিন রহিম মেম্বার সালেক ও মানিককে সঙ্গে করে নিয়াজ মাতব্বরের বাড়িতে এসে পুকুর ও জমি কেনার প্রস্তাব দিল।

নিয়াজ মাতব্বর রহিম মেম্বারকে মুরগীর ও দুধের ফার্ম করতে দেখে আগেই বেশ অবাক হয়েছিলেন। চিন্তা করেছিলেন, সে এত টাকা পেল কোথায়? গ্রামের দু'চারজনকে সেকথা জিজ্ঞেসও করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বলেছে, আজকাল সরকার এসব করার জন্য লোন দিচ্ছে। রহিম মেম্বার হয়তো সরকারের কাছ থেকে লোন নিয়ে এসব করছে। তাদের কথা শুনে নিয়াজ মাতব্বর তখন তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু আজ রহিম মেম্বারকে তার পুকুর ও জমি কেনার কথা শুনে ভীষণ অবাক হলেন। তিনি মনের আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন, দেখুন মেম্বার সাহেব, পুকুর ও জমি বেচার কথা পরে বলব; তার আগে বলুন, সরকার কি জমি কেনার জন্যও টাকা লোন দেয়? আমি তো শুনেছিলাম, কি সব ফার্ম-টার্ম করার জন্য নাকি লোন দেয়।

রহিম মেম্বার বললেন, ফার্ম করার ব্যাপারে যা শুনেছেন তা সত্য। তবে জমি কেনার জন্য সরকার কোনো লোন দেয় না। আর আমি যা করছি তা সরকারের কাছ থেকে লোন নিয়ে করছি না। ঢাকার একজন ফাইন্যান্সার পেয়েছি। তার টাকা আর আমাদের শ্রম। যাই হোক, আপনার ঐ পুকুরটায় আমরা মাছের চাষ করতে চাই। আর

জমিগুলোতে উন্নতমানের ধান চাষ করতে চাই। ওগুলো আপনি বেচবেন কিনা,বলুন? অবশ্য আমরা ওগুলোর ন্যায্য দাম দেব।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, আল্লাহ আপনার ভাগ্য খুলে দিয়েছেন। তা না হলে এমন পার্টনার পান। পুকুর ও জমি বিক্রির ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। আমার ছেলে আনোয়ারকে খবর দিই। সে কি বলে দেখি। আপনাদের কাজকর্ম দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তারপর মানিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি হোসেন মিয়ার বাড়িতে থাক না? সে তোমার কি রকম চাচা?

মানিক বলল, হ্যাঁ থাকি। উনি আমার রক্তের কেউ নন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আপন।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, ভালো বেশ ভালো। আজকাল কে কার জন্য করে। হোসেন মিয়ার ছেলেটা মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে এল না। শুনেছি, যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে। ছেলের শোকে হোসেন মিয়া তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেল। তবু তোমাকে পেয়ে একটু সান্ত্বনা পেয়েছে। তারপর রহিম মেম্বারকে বললেন, আপনারা এখন আসুন, আমার ছেলের মতামত নিয়ে পরে জানাব।

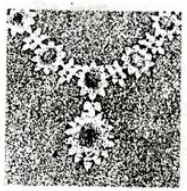

এদিকে রেবেকার বিয়ে তার বাবার বন্ধুর ছেলের সঙ্গে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর কার্ড দেয়ার জন্য সে পান্থদের বাড়িতে এল।

আফসানা বেগম বললেন, পান্থ তো চার-পাঁচ মাস হল বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে?

তা জানি না মা, বলে যায়নি।

রেবেকা খুব অবাক হয়ে বলল, আপনারা খোঁজ করেন নি?

যাওয়ার সময় একটা চিঠিতে লিখে রেখে গেছে, সে দেশের ও দশের কাজ করার জন্য যাচ্ছে। তাকে যেন আমরা খোঁজাখুঁজি না করি।

রেবেকা কার্ডটা ওনার হাতে দিয়ে বলল, আপনারা যাবেন। তারপর সে বহ্নির কাছে গেল।

বহ্নি কার্ড হাতে নিয়ে পড়ে বলল, পান্থ তা হলে শেষ মেশ তোকে বিট্রে করল?

রেবেকা মুখ ভার করে বলল, বিট্রে করবে কেন? আমি তাকে ভালবাসলেও সে তো আমাকে বাসেনি।

তুই তাকে তোর মনের কথা জানাস নি?

জানিয়েছিলাম। শুনে বলল, আমি নাকি ভুল করেছি। সে কাউকে ভালবাসে না। ভালবাসা কি জিনিস জানে না। আরও বলল, কবে বিয়ে করবে-না-করবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

তাকে বিয়ের কার্ড দিয়েছিস?

তার মাকে দিয়েছি। সে আজ চার-পাঁচ মাস হল কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ। তারপর তার চিঠি লিখে যাওয়ার কথা বলল।

পান্থ দেশ ও দশের উপকার করার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে শুনে বহ্নি বেশ অবাক হলেও মনে মনে খুশি হল। সেও দেশ ও দশের উপকার করতে চায়। গরিবদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তার মন কাঁদে। ভোগবিলাসের জীবন তার ভালো লাগে না। ভালোভাবে জীবন-যাপন করার পর মানুষ যে কেন প্রাচুর্যের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়, তা ভেবে পায় না। মালিকরা নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের ভালো মন্দের দিকে লক্ষ্য না করে তাদের উপর অত্যাচারের স্টীমরুলার চালাচ্ছে জেনে সে খুব দুঃখ অনুভব করে। এসব নিয়ে বহ্নি বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করে। বহ্নি জানে গ্রামেও তাদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি আছে। তার দাদা-দাদী ও এক ফুপু সেখানে থাকেন। একদিন বাবাকে সে গ্রামের গরিবদের জন্য কিছু করার জন্য বলেছিল।

আনোয়ার সাহেব মেয়ের কথা শুনে বলেছিলেন, গরিবদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি থাকা ভালো। তবে তাদেরকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। দিলে তারা ধনীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবে।

বহ্নি বলেছিল, বাবা তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। গরিবদের ভালো মন্দের দিকে ধনীরা যদি লক্ষ্য রাখে, তা হলে তারা সংগ্রামে নামবে কেন? বরং তারা নিজেদের স্বার্থে আরও পরিশ্রমী হবে। ধনীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করবে।

আনোয়ার সাহেব বললেন, তুই এখন ছেলেমানুষ, তেমন জ্ঞান হয়নি। যখন আরও জ্ঞান হবে তখন বুঝবি আমার কথা কতটা সত্য।

আজ পান্থ বাবার বিপুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে দেশ ও দশের উপকার করার জন্য চলে গেছে জেনে তার প্রতি বহ্নির মনে শ্রদ্ধা জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বলল, তাই নাকি? অমন অহঙ্কারী ছেলের আবার দেশপ্রেম?

রেবেকা বলল, সে যাই হোক, তুই বিয়েতে আসবি তো?

বহ্নি বলল, যাব না মানে? নিশ্চয় যাব! তোর বিয়েতে যাব না তো কার বিয়েতে যাব?

পান্থ অর্থাৎ মানিক বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে যখন মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে গেছে তখন বাড়িতে যায় নি। কিন্তু প্রতিবারে একটা করে চিঠি পোস্ট করে তাতে সে ভালো আছে লিখলেও কোথায় থাকে বা কি করছে জানায় নি। তার ইচ্ছা প্রজেক্টগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হবার পর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কিছু বলবে।

প্রথম যেদিন আফসানা বেগম ছেলের চিঠি পেলেন, সেদিন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীর হাতে দেয়ার সময় বললেন, পান্থর চিঠি। সে ঢাকায় এসেছিল অথচ আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি।

শরীফ সাহেব চিঠিটা পড়ে খামের উপরের সীল দেখে বুঝতে পারলেন, ঢাকা থেকে পোস্ট করা হয়েছে। বললেন, ওর জন্য কোনো চিন্তা করো না। কতদিন আর থাকতে পারবে? দেখবে একদিন ঠিক ফিরে আসবে।

আফসানা বেগম ধরা গলায় বললেন, ছেলে আমার কোথায় কিভাবে আছে? থাকা-খাওয়ার হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে! তুমি বাবা হয়ে এসব না ভাবলেও আমি মা হয়ে কি চুপ করে থাকতে পারি? কতবার বললাম খোঁজ-খবর নিতে, তা যদি আমার কথা কানে নাও।

শরীফ সাহেব বললেন, সে কি শুধু তোমার একার ছেলে, আমার ছেলে নয়? আমিও কি কম চিন্তা করি? তবু কেন তার খোঁজ-খবর নিচ্ছি না শুনবে? আমি চাই সে স্বাবলম্বী হোক। তুমি তো তাকে কচি খোকার মতো সব সময় আগলে রেখেছিলে। সে চলে গিয়ে নিজেকে চিনুক, দুনিয়াকে জানুক, এটাই আমি চাই।

আফসানা বেগম কাতর স্বরে বললেন, তাই বলে বাবা খোঁজ-খবর রাখবে না, এ কেমন কথা?

শরীফ সাহেব বললেন, খোঁজ-খবর যে একদম রাখিনি তা নয়। গতকাল ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেব ফোন করে জানালেন, পান্থ বেশ কিছু টাকা তুলেছে।

আফসানা বেগম বললেন, তাই নাকি? তারপর আবার বললেন, টাকা যত খুশি তুলুক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাসায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করল না কেন? তুমি ব্যাংকের ম্যানেজারকে ফোন করে বলে রেখ, পান্থ আবার টাকা তুলতে এলে তিনি যেন তাকে বাসায় আসতে বলেন।

শরীফ সাহেব স্ত্রীকে খুশি করার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, তাই বলব।

এরপর পান্থ যখন আরও দু'তিনবার এসে প্রায় সাত-আট লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেল তখন ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে তার বাবার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু পান্থ বাসায় যায় নি।

নিয়াজ মাতব্বর ছেলেকে পত্রে জমি বিক্রি করার কথা না জানিয়ে লিখলেন–

তোমাদেরকে অনেক দিন দেখি নি। তোমরা সবাই কয়েকদিনের জন্য এসে ঘুরে যাও। আর বৈষয়িক ব্যাপারে কিছু কথা আছে যা পত্রে লিখলাম না; সাক্ষাতে বলতে চাই।

বাবার চিঠি পেয়ে আনোয়ার সাহেব স্ত্রী ও বহ্নিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এলেন। মারুফের সাথে ইভার বিয়ে হয়ে গেছে। সে শ্বশুর বাড়িতে। তাই আসতে পারল না।

নিয়াজ মাতব্বর ছেলেকে রহিম মেম্বারের কথা বললেন।

আনোয়ার সাহেব বেশ রেগে গিয়ে বললেন, না না, আমরা পুকুর বা জমি কিছুই বেচব না। তিনি অন্য জমি কিনে সেখানে যা করার করুন। ওঁর সুবিধের জন্য আমরা জমি বেচতে যাব কেন?

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, পুকুরটা তো এমনি ভরাট হয়ে পড়ে আছে। গরমের সময় পানি হাঁটু সমান হয়ে যায়। তোমাকে কতবার বললাম, পুকুরটা কাটিয়ে মাছের চাষ কর। তা ছাড়া গ্রামের লোকেরা গরমের সময় গোসল করার ও খাওয়ার পানির কষ্ট পায়। পুকুরটা কাটালে তাদেরও কষ্ট দূর হত। আর হোসেন মিয়ার ডাঙ্গার নিচের জমিগুলোতেও

ধান বেশি পাওয়া যায় না। কোল ক্যাঁদালের তেজী জমি। ফলবার সময় হেপসে পড়ে গিয়ে ধান চিটে হয়ে যায়। তারপর যদিও কিছু হয়, তা পাড়ার হাঁস-মুরগী খেয়ে শেষ করে দেয়। তাই মনে করেছিলাম, তুমি বেচতে রাজি হবে। কিন্তু তুমি যখন চাচ্ছ না তখন আর কি করা যাবে। ডেকে না হয় তাদেরকে তোমার মতামত জানিয়ে দেব।

আনোয়ার সাহেব বললেন, হ্যাঁ বাবা, তুমি তাই জানিয়ে দিও। কোনো কিছু বেচতে আমি একদম নারাজ।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, কিন্তু তুমি তো এখানে থাক না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। কতদিন আর এসব দেখাশোনা করব? বেচে দিলে কি আর এমন ক্ষতি হবে? রহিম মেম্বার পুকুরটা কাটিয়ে মাছের চাষ করবে। জমিতে উন্নতমানের বেশি ফলনের ধানের চাষ করবে। তাতে দেশের ও গ্রামের সাধারণ লোকের অনেক উপকার হত।

আনোয়ার সাহেব বললেন, ঐসবের জন্য গ্রামে কি আর জায়গা-জমি নেই? টাকা থাকলে আবার জায়গা-জমির অভাব? বাবা, আপনি বুঝতে না পারলেও আমি রহিম মেম্বারের মতলব বুঝতে পেরেছি। তিনি আমাদের জায়গা-জমি কিনে বড় হতে চান। এসব করে পাঁচজনের কাছ থেকে সুনাম অর্জন করতে চান। আর আমাদেরকে সবার কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। আচ্ছা বাবা, সে যে এত কিছু করছে, টাকা পাচ্ছে কোথায়? আমার মনে হয়, মেম্বারগিরি করে সরকারের ও জনগণের বহু টাকা মেরেছে।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, তুমি শুধু শুধু ভালো লোককে খারাপ বলছ। আমি কি তাকে চিনি না? তার মতো সৎ ও ধার্মিক লোক দেশে ক'টা আছে? না জেনে কারো প্রতি খারাপ মন্তব্য করা গোনাহ। তার কাছে জমি বেচতে না চাইলে নাই বেচবে, তাই বলে এরকম বলা তোমার উচিত হয়নি। আর টাকার কথা যা বললে, সে ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, ঢাকার কোনো এক লোক ইনভেস্ট করছে। যা কিছু কিনছে বা করছে তা সব সেই লোকটার নামে কাগজপত্র হচ্ছে।

আনোয়ার সাহেব বললেন, সেসব যা কিছু হোক না কেন, আপনি তাকে জানিয়ে দেবেন, আমরা কোনো কিছু বিক্রি করব না। কথা শেষ করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁনারা যখন কথা বলছিলেন তখন বহ্নিও সেখানে ছিল। বাবা বেরিয়ে যেতে সে দাদাকে বলল, আমি রহিম মেম্বারের খামার দেখতে যাব।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, বেশ তা যাবি। কাল সকালে নিয়ে যাব। সেই সময় তোর বাপের মতামতটাও রহিম মেম্বারকে জানিয়ে আসব।

পরের দিন সকালে নাশতা খেয়ে নিয়াজ মাতব্বর নাতনিকে সাথে নিয়ে রহিম মেম্বারের ফার্মে এলেন। গেটে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, রহিম মেম্বার আছেন নাকি?

দারোয়ান বলল, আছেন। তারপর অফিস রুমের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ওখানে যান।

গেটের অল্প দূরে এক পাশে তিন কামরা পাকা অফিস রুম। রহিম মেম্বার প্রথম রুমটায় বসেন। তিনি ফার্মের শ্রমিকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আর বাইরের লোকজন এলে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। পরের রুমটায় ওনার ছেলে

সালেক বসে। সে আয়-ব্যয়ের হিসাব করে। আর শেষেরটায় বসে মানিক। প্রজেক্টের নকশা ও সেসব কার্যকর করার ভার তার উপর। সে এখানকার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছে। তিনটে রুমেই ভিতর থেকে যাতায়াত করার জন্য দরজা আছে।

নিয়াজ মাতব্বর নাতনিকে নিয়ে যে রুমটায় ঢুকলেন, সেটা রহিম মেম্বারের। তাকে দেখে সালাম দিলেন।

রহিম মেম্বার উঠে দাঁড়িয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আসুন আসুন। তারপর দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে বললেন, কেমন আছেন?

নিয়াজ মাতব্বর নাতনিকে বসতে বলে নিজেও বসে বললেন, ভালো আছি। তা আপনাদের কাজকর্ম কেমন চলছে বলুন।

রহিম মেম্বার বললেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ভালোই চলছে। তিনি বহ্নিকে চেনেন। আগেও অনেকবার দেখেছেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো মা, দাদুর সঙ্গে আমাদের ফার্ম দেখতে এসেছ বুঝি? কবে এলে? তোমার আব্বা এসেছেন?

বহ্নি বলল, মা-বাবার সঙ্গে গতকাল এসেছি।

মন্টু নামে একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে এখানে পিয়নের কাজ করে। প্রয়োজনে চা তৈরি করে সবাইকে খাওয়ায়। রহিম মেম্বার তাকে বললেন, তুমি সালেক ও ম্যানেজারকে এখানে আসতে বলে চা তৈরি করে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথমে সালেক এসে নিয়াজ মাতব্বরের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করল।

সালেক ও বহ্নি পরস্পরকে চেনে। স্কুলে পড়ার সময় বহ্নি মা-বাবার সাথে প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে আসত। সে সময় সালেক বহ্নির ছোট হলেও তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখাত। কতবার তাদের গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে। তাকে সে বহ্নি আপা বলে ডাকত। কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়ার সময় বহ্নি খুব কম গ্রামে এসেছে। তবে যখনই এসেছে তখনই সালেকের সঙ্গে দেখা করেছে। এখন সালেককে দেখে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ সালেক?

সালেক বলল, ভালো আছি। তুমি কিন্তু এবারে অনেক দিন পরে এলে আপা।

বহ্নি হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। এবারে প্রায় তিন বছর পর এলাম। তুমি তো কলেজে পড়তে; পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ মনে হচ্ছে?

সালেক বলল, বি.এ. পাস করে আর পড়িনি।

নিয়াজ মাতব্বর বলে উঠলেন, ও তো এখন সমাজকল্যাণের কাজ করে বেড়াচ্ছে।

বহ্নি বলল, তাই নাকি? তা হলে তো ভালোই।

এমন সময় মানিক এসে নিয়াজ মাতব্বরের সঙ্গে বহ্নিকে দেখে চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সালাম দিল।

এবারে ঢাকা গিয়ে তাকে কেউ যেন চিনতে না পারে সে জন্য জিরো পাওয়ারের রঙিন চশমা নিয়েছে। সেটা সচরাচর ব্যবহার করে না। বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় অথবা বাইরের কোনো লোকজন দেখা করতে এলে ব্যবহার করে। মন্টুর মুখে নিয়াজ মাতব্বরের সঙ্গে একজন মহিলাও এসেছে শুনে চোখে চশমা দিয়ে এসেছে।

নিয়াজ মাতব্বর সালামের উত্তর দেয়ার পর রহিম মেম্বার মানিককে বসতে বললেন। মানিক বসার পর মন্টু সবাইকে চা-বিস্কুট দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে রহিম মেম্বার নিয়াজ মাতব্বরকে বললেন, আমরা যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেটার খবর কি বলুন?

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, আনোয়ার তো বেচতে চায় না। আপনাদের প্রজেক্টের কথা শুনে বলল, ওঁরা অন্য জায়গা কেনার ব্যবস্থা করুক।

রহিম মেম্বার বললেন, আপনারা না বেচলে তাই করতে হবে। তবে আপনাদেরগুলো পেলে আমাদের খুব সুবিধে হত।

মানিক রহিম মেম্বারকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা ওঁর ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করে অনুরোধ করি চলুন। তারপর যা করার করা যাবে।

মানিকের কথা শুনে নিয়াজ মাতব্বর বললেন, তা করতে পার। তবে সে রাজি হবে বলে মনে হয় না। হলে আমাকে না করত না।

বহ্নি এতক্ষণ মানিককে বারবার লক্ষ্য করছিল আর চিন্তা করছিল, এ পান্থ নয় তো? দাড়ি ও চশমার জন্য সে ঠিক চিনতে পারছে না। তার কথা শুনে দাদুকে বলল, ওঁরা যখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন তখন গিয়েই দেখুক না। তারপর মানিককে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনাকে বেশ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ঢাকায় মনে হয় দেখেছি। এখানেই কি আপনার বাড়ি? আপানাকে তো এখানে আগে কখনও দেখিনি!

মানিক বলল, ঢাকায় আমার মতো হয়তো অন্য কাউকে দেখেছেন। আমি বহুদিন বিদেশে ছিলাম, কয়েক মাস হল এসেছি।

নিয়াজ মাতব্বর রহিম মেম্বারকে বললেন, আমার নাতনি আপনাদের ফার্ম দেখতে এসেছে।

রহিম মেম্বার বললেন, সে তো খুব ভালো কথা। তারপর সালেককে বললেন, তুমি বহ্নি মাকে সবকিছু দেখিয়ে নিয়ে এস।

সালেক বহ্নিকে বলল, চল আপা।

বহ্নি সালেকের সাথে ঘুরে ঘুরে ফার্ম দেখতে লাগল। কিন্তু তার মন মানিকের দিকে পড়ে আছে। কেবলই মনে হচ্ছে, পান্থই ছদ্মবেশে মানিক সেজে এখানে রয়েছে। থাকতে না পেরে বহ্নি একসময় সালেককে জিজ্ঞেস করল, দাড়িওয়ালা চশমাপরা ছেলেটা তোমাদের ম্যানেজার, তাই না?

সালেক বলল, হ্যাঁ।

ওঁর নাম কি?

মানিক।

বাবার নাম?

বাবার নাম জানি না।

বহ্নি একটু অবাক হয়ে বলল, এ কেমন কথা; গ্রামের লোকের নাম জান না।

মানিক ভাইয়ের বাবা এখানকার লোক নন।

কোথাকার লোক, জান?

সালেক হঠাৎ বলে ফেলল, ঢাকার।

ঢাকার?

সালেক নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মানিক ভাইয়ের বাবা ঢাকায় থাকতেন। মানিক ভাই সেখানেই জন্মায়। আসলে আমি তাদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। মানিক ভাই অনেক দিন বিদেশে থেকে প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে এখানে এসেছে।

বহ্নি বলল, ঠিক আছে। উনি তো তোমাদের অফিসে চাকরি করছেন। খাতায় নিশ্চয় ওঁর আসল ঠিকানা ও বাবার নাম লেখা আছে। খাতা দেখে আমাকে জানাবে।

মানিক সালেককে তার আসল পরিচয় কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিল বলে এতক্ষণ বহ্নিকে মিথ্যা বলল। এবার তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি মানিক ভাইয়ের সম্বন্ধে এতকিছু জানতে চাইছ কেন, আপা?

বহ্নি বলল, আমি এমন একজনকে জানি, যার সঙ্গে তোমার মানিক ভাইয়ের অনেক মিল। গলার স্বরটাও এক। যাক গে, তোমাদের ফার্ম দেখে খুব ভালো লাগল। প্রত্যেক গ্রামে যদি এ রকম করা হয়, তা হলে দেশের যেমন উপকার হত, তেমনি গ্রামের অনেক লোকের কর্মসংস্থান হত।

সালেক আবার হঠাৎ করে বলে ফেলল, জান আপা, এসব প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবকিছু মানিক ভাইয়ের। সেই তো আমাকে ও আব্বাকে এই কাজে নামিয়েছে। মানিক ভাই খুব উচ্চশিক্ষিত। প্রচুর টাকার মালিক। তার টাকাতেই তো এসব হচ্ছে। কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই। গরিবদের দুঃখ কিভাবে দূর করা যায়, তা নিয়ে সব সময় চিন্তা করে। গরিবদের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করে, যেন সেও তাদেরই একজন। অনেক গরিব ছেলেমেয়েকে নিজের খরচায় লেখাপড়া করাচ্ছে। গরিব কৃষকদের চাষাবাদ করার জন্য গরু ও লাঙ্গল কিনে দিয়েছে। গ্রামের লোকজন মানিক ভাইকে আল্লাহ পাকের রহমতস্বরূপ মনে করে। আবালবৃদ্ধবণিতা সবার কাছে সে 'মানিক ভাই' বলে পরিচিত।

সালেকের কথা শুনতে শুনতে বহ্নি খুব অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিল, মানিক যদি সত্যি পান্থ হয়, তা হলে সে মহৎ। তাকে ধন্যবাদ জানান উচিত। সালেক চুপ করে যেতে বহ্নি বলল, তাই নাকি? কিন্তু আগে তুমিই তো বললে, উনি এখানে ম্যানেজারের পোষ্টে চাকরি করছেন।

সালেক আবেগের বশে মানিকের প্রশংসা করতে গিয়ে হঠাৎ করে এসব বলে ফেলে নিজের ভুল বঝতে পারল। বলল, তা করে।

বহ্নি বলল, তবে তুমি যে বললে ওর টাকাতেই সবকিছু হচ্ছে?

সালেক বলল, মানে সে ঢাকায় একজন ফাইন্যান্সার জোগাড় করে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসে।

বহ্নি জিজ্ঞেস করল, ওর তো এখানে বাড়িঘর নেই, থাকেন কোথায়?

সালেক বলল, আমাদের পাড়ার হোসেন মিয়ার বাড়িতে। উনি মানিক ভাইয়ের কি রকম যেন চাচা হন।

বহ্নি আবার জিজ্ঞেস করল, হোসেন মিয়া কে?

সালেক বলল, আপা দেখছি শহরে থেকে গ্রামের লোকজনকেও ভুলে গেছ। ঐ যে, যার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

বহ্নি বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। সালেকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার আরো সন্দেহ হল, সে যেন মানিকের সব কথা বলতে চাচ্ছে না। বলল, চল এবার ফেরা যাক। অফিসের কাছে এসে বলল, তোমরা আজকালের মধ্যে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেও। তারপর অফিসে ঢুকে রহিম মেম্বারকে বহ্নি বলল, আপনাদের প্রকল্প দেখে খুব ভালো লাগল।

রহিম মেম্বার বললেন, দো'য়া করো মা, আল্লাহ্ যেন পুরো প্রকল্প বাস্তবায়ন করার তওফিক আমাদেরকে দেন।

নিয়াজ মাতব্বর রহিম মেম্বারকে বললেন, এবার আমরা আসি। তারপর সালাম বিনিময় করে নাতনিকে নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন সন্ধ্যের পর রহিম মেম্বার মানিক ও সালেককে সঙ্গে নিয়ে নিয়াজ মাতব্বরের বাড়িতে গেলেন।

নিয়াজ মাতব্বর বৈঠকখানায় নাতনি ও ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সালাম বিনিময় করে তাদেরকে বসতে বললেন।

আপ্যায়নের পর আনোয়ার সাহেব বললেন, আপনাদের কথা বাবা আমাকে বলেছেন; কিন্তু আমি পুকুর বা জমি কোনোটাই বিক্রি করব না। আপনারা অন্যখানে চেষ্টা করুন।

মানিক রহিম মেম্বারকে বলল, চাচা, আপনি অনুমতি দিলে আমি ওঁনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই।

রহিম মেম্বার বললেন, অনুমতি নেয়ার কি আছে, তুমি কি বলতে চাও বল।

মানিক ওঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনারা না বেঁচলে আমরা তাই করব। তবে আপনাদের পুকুর ও জমিগুলো পেলে আমাদের অনেক সুবিধে হত। তাই আমাদের প্রস্তাবটা ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

আনোয়ার সাহেব একটু রাগের সঙ্গে বললেন, ভেবে দেখার কিছু নেই। ঐগুলো পেলে আপনাদের যেমন সুবিধে হবে তেমনি আমাদের অনেক অসুবিধে আছে।

মানিক বলল, তা অস্বীকার করছি না। তবে আমরা যদি আপনাদের অসুবিধেগুলো দূর করার ব্যবস্থা করি, তা হলে নিশ্চয় অমত করবেন না?

আনোয়ার সাহেব আরো একটু রেগে গেলেন। রহিম মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছোকরাটা কে বলুন তো, এত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কথা বলছে?

রহিম মেম্বার কিছু বলার আগেই মানিক বলল, আমি ফার্মেই কাজ করি। আপনি আমার কথা বুঝতে না পেরে রেগে যাচ্ছেন। আমি বলতে চাইছি, ঐ পুকুর ও জমিগুলো থেকে যা আয় হয়, তার চেয়ে বেশি আয়ের জমি অন্য জায়গায় কিনে দেব। অথবা আপনারা যদি চান সেই পরিমান নগদ টাকাও দিতে পারি।

এ কথায় আনোয়ার সাহেব অপমান বোধ করে ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, টাকার গরম দেখাচ্ছ? অন্যের যে আরও বেশি টাকা থাকতে পারে তা বুঝি জান না?

মানিক শান্তভাবে বলল, আপনি আবার আমার কথা ভুল বুঝে রেগে যাচ্ছেন। আমরা টাকার গরম দেখাচ্ছি না। আপনি সুবিধে-অসুবিধের কথা বললেন, তাই বলেছি।

আনোয়ার সাহেব বুঝতে পারলেন, ছেলেটা খুব টেলেন্ট ও বিনয়ী। ভাবলেন, রেগে-যাওয়াটা ঠিক হয়নি। গম্ভীর স্বরে বললেন, ঐসব বিক্রির সঙ্গে আমাদের মান-সম্মান জড়িত।

মানিক মৃদু হেসে বলল, এটাও আপনার ভুল ধারণা। ধারণটা ঠিক হত, যদি কেউ নিজের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কিনত। আমরা তো গ্রামের সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য কিনতে চাচ্ছি। এতে আপনাদের সম্মান আরও বাড়বে।

আনোয়ার সাহেব মানিকের যুক্তি শুনে কোনো কথা বলতে পারলেন না। ভাবলেন, ছেলেটা বেশ শিক্ষিত। তার সঙ্গে ঐভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।

নিয়াজ মাতব্বরও মানিকের কথা শুনে বুঝতে পারলেন, মানিক নিশ্চয় কোনো উচ্চবংশের শিক্ষিত ছেলে। কোনো কারণে এখানে আছে।

আর বহ্নি গতকাল মানিককে দেখে এবং সালেকের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছে তা সারারাত চিন্তা করে প্রায় নিশ্চিত হয়েছে পান্থই মানিক। এখন তার কথা শুনে আরো নিশ্চিত হল। মানিক থেমে যেতে বহ্নি তার বাবাকে বলল, আমাদের তো অনেক জমি-জায়গা রয়েছে। তা ছাড়া গতকাল দাদু বললেন, ঐগুলো থেকে তেমন কিছু আয় হয় না। জমিগুলো দিলে যদি ওঁদের সুবিধে হয়, তা হলে বিক্রি করেই দাও। গ্রামের মানুষের উপকার হবে।

আনোয়ার সাহেব বাবার কথা শুনে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি গ্রামের উপকারের জন্য বিক্রি করতে রাজি। এখন মেয়ের কথায় বুঝতে পারলেন, সেও তাই চায়। নিজেকে অপমানিত বোধ করে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে রাগটা সামলে নিয়ে নিয়াজ মাতব্বরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বাবা, আপনি যা ভালো বুঝেন করুন। আমি কাল সকালে ঢাকা ফিরে যাব। অনেক কাজ ফেলে এসেছি। তারপর রহিম মেম্বারকে বললেন, এখন আপনারা আসুন। পরে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

রহিম মেম্বার বললেন, তাই করব। তারপর সালাম বিনিময় করে তিনজনে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তারা চলে যাওয়ার পর আনোয়ার সাহেব মেয়েকে বললেন, তুইও কি কাল আমাদের সঙ্গে যাবি?

বহ্নি বলল, না বাবা, আমি কিছুদিন দাদুর কাছে থাকব। তুমি মাকে নিয়ে যাও।

আনোয়ার সাহেব বললেন, তাই থাক। যখন যেতে মন চাইবে তখন চিঠি দিয়ে জানাস; ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। পরের দিন তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা চলে গেলেন।

বহ্নি দু'তিন দিন ধরে চিন্তা করল, কিভাবে পান্থর ছদ্মবেশ উন্মোচন করা যায়। কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারল না। একদিন সে প্রাতঃভ্রমণে বের হল। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে যেখানে প্রাইমারী স্কুল ও বল খেলার মাঠ আছে, সেদিকে গিয়ে দেখল, মানিক ট্রাকস্যুট পরে খেলার মাঠের এমাথা-ওমাথা দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ স্কুলের কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তাকে বসে বিশ্রাম নিতে দেখে তার

দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বহ্নি যখন মানিকের কাছে এল তখন সে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়াল। বহ্নি মানিকের পিছন দিক থেকে আসছিল বলে সে তাকে দেখতে পায়নি। বহ্নি সামনে এসে বলল, প্রতিদিন এত দূরে দৌড়াতে আসেন?

মানিক বহ্নিকে দেখে বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সালাম দিয়ে বলল, আপনি?

মানিকের চোখে এখন চশমা নেই? বহ্নি তার চোখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হল, এ পান্থ। মৃদু হেসে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছ।

মানিক বুঝতে পারল, চোখে চশমা না থাকায় বহ্নি চিনে ফেলেছে। তাই তুমি করে বলছে। তবু সে ধরা দিল না। বলল, আপনি সালামের উত্তর দিলেন না যে? জানেন না, উত্তর না দিলে গোনাহ্ হয়?

না জানি না।

এত সকালে একা একা এত দূরে এলেন কি করে?

পান্থ তাকে এখনও আপনি করে বলছে দেখে বহ্নি একটু রাগের সঙ্গে বলল, কেন? তোমার কি ধারণা মেয়েরা হাঁটতে পারে না? একা একা কোথাও যেতেও পারে না? একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন।

এখানে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছ, সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে না-চেনার ভান করছ কেন?

আপনি খুব সম্ভব ভুল করছেন।

না, আমি ভুল করিনি।

তাই যদি হয়, তা হলে আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

তুমি যে পান্থ, তা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর।

পান্থ কে?

বহ্নি ক্রমশ রেগে যাচ্ছে। বেশ রাগের সঙ্গে বলল, দেখ পান্থ, তুমি সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারনি। প্রথম দিনেই চিনেছিলাম, তবে চোখে চশমা ছিল বলে সিওর হতে পারিনি। এখনও তুমি অস্বীকার করবে?

যেন খুব লজ্জা পেয়েছে সেই রকম ভান করে পান্থ বলল, দেখুন, আপনি খুব বড় ভুল করছেন। আমি পান্থ নই। তাকে আমি চিনি না, জানি না। আমি মানিক। একই রকম দেখে অনেকে অনেক সময় ভুল করে। আমার মনে হয়, আপনিও তাই করছেন। চলুন, এবার ফেরা যাক বলে পান্থ হাঁটতে শুরু করল।

বহ্নি রাগে কথা বলতে পারল না। সে তার পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

মানিক একটু দূরে চলে এসেছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। বহ্নি কাছে এলে তার পাশে যেতে যেতে বলল, আপনি সেদিন আমাদের অনেক বড় উপকার করেছেন। আপনার কথায় আপনার বাবা রাজি হলেন। আপনার দাদু গতকাল খবর পাঠিয়েছেন, পুকুর ও জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার জন্য।

বহ্নি তা জানে। রাগে মানিকের কথার কোনো উত্তর দিল না। এমন কি যখন তারা তেমাথা রাস্তায় আসার পর মানিক বলল, আপনি তো এবার অন্য পথে যাবেন, চলি আল্লাহ হাফেজ–তখনও বহ্নি কোনো কথা না বলে চলে গেল।

মানিক কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। একসময় তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তারপর চলতে শুরু করে ভাবল, বহ্নির এটা অহঙ্কার, রাগ, না অভিমান?

আর বহ্নি যেতে যেতে চিন্তা করল, পান্থ তুমি যতই নিজেকে মানিক বলে জাহির কর না কেন, আমি তোমাকে ঠিকই চিনেছি। তুমি যে আমাকে জব্দ করার জন্য ভনিতা করলে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও দেখব, কতদিন তুমি নিজেকে ছদ্মবেশে আড়াল করে রাখতে পার?

এরপর বহ্নি আরো তিন-চারদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্কুলের বারান্দার জানালা থেকে পান্থকে দৌড়াতে দেখল। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করল না। একদিন সকালে দাদুকে বলল, আমি একটু পূর্বপাড়া থেকে ঘুরে আসি।

দাদু বললেন, রোজ তো ভোরে বেড়াতে যাও; এখন আবার যাবে কেন?

বহ্নি হেসে উঠে বলল, ভোরে মর্নিংওয়াক করতে যাই, বেড়াতে যাই না। এখন বেড়াতে যাব।

দাদুও হেসে উঠে বললেন, তোমাদের মত আপটুডেট ইয়াং লেডীদের সঙ্গে কি আর আমার মতো ওল্ডম্যান পারবে? যেতে চাচ্ছ যাও। একা যাবে, না সাথে কাউকে যেতে বলব?

বহ্নি বলল, এটা আমার নিজের গ্রাম, সাথে কাউকে লাগবে না। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল।

এই কয়েকদিন মানিক ভোরে মাঠে দৌড়াতে এসে আশা করেছিল, ঐদিন বহ্নি রাগ করে কথা না বললেও আবার আসবে। কিন্তু এল না দেখে চিন্তা করল, তার রাগ এখনও পড়েনি। আজ ফিরে এসে গোসল করে জামা-কাপড় পরছে এমন সময় তানজিলা এসে বলল, বহ্নি নামে একটা মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ফুপা তোমাকে ডাকছে।

এখানে মাসখানেক থাকার পর মানিক হোসেন মিয়াকে রাজি করিয়ে নিজের জন্য একটা পাকা রুম বানিয়েছে। প্রথম দিকে সে বাজার করত। কাজে নামার পর একদিন এক হাজার টাকা হোসেন মিয়ার হাতে দিয়ে বলল, চাচা আমি রহিম মেম্বারের ফার্মে চাকরি করছি। বাজারপাতি যা করার আপনি করবেন।

হোসেন মিয়া টাকা নিতে রাজি হলেন না। বললেন, তুমি আমার ছেলের মতো ছেলেকে খাইয়ে কোনো বাবা টাকা নেয় না।

মানিক বলল, ছেলে বেকার থাকলে বা তার টাকা-পয়সা না থাকলে আপনার কথা মানতাম। কিন্তু আমার টাকা আছে এবং চাকরিও করছি। রোজগার করে মা-বাবার হাতে টাকা দেয়াই তো ছেলের কর্তব্য। সেই থেকে প্রতিমাসে টাকা দেয়। আর তানজিলার পড়াশোনার ও অন্যান্য সব খরচ সে বহন করে। তানজিলা সেকথা জেনে মানিককে বড় ভাইয়ের মতো মনে করে।

এখন তানজিলার মুখে বহ্নি এসেছে শুনে সে একটু ঘাবড়ে গেল। ভাবল, এ বার আর রক্ষে নেই। তবু চিন্তা করল, কিছুতেই বহ্নির কাছে ধরা দেবে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তানজিলা বলল, কিছু বলছ না কেন ভাইয়া?

মানিক বলল, সে কোথায়?

ফুপার সঙ্গে কথা বলছে।

যা, এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

তানজিলা চলে যেতে মানিক ডায়েরীটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে ড্রয়ারে রাখল।

বহ্নি আসার পথে হোসেন মিয়াকে দেখতে পেয়ে সালাম দিয়ে বলল, চাচা কেমন আছেন? সেদিন সালামের উত্তর দেয়নি বলে মানিক যে কথা বলেছিল, বাড়িতে এসে দাদুকে সেকথা জিজ্ঞেস করে। দাদু বললেন, মানিক হাদিসের কথা বলেছে। তারপর তাকে সালামের নিয়ম ও তার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। তাই আজ হোসেন মিয়াকে দেখে সালাম দিল।

হোসেন মিয়া সালামের উত্তর দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি কে মা? তোমাকে তো চিনতে পারছি না?

বহ্নি বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি নিয়াজ মাতব্বরের নাতনি। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি কতবার আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে গেছেন।

হোসেন মিয়া গালভরা হাসি হেসে বললেন, ও তাই তো, এবার মনে পড়েছে। তুমি আনোয়ারের মেয়ে। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। তাই চিনতে পারিনি। তা এদিকে কোথায় যাবে?

বহ্নি বলল, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

হোসেন মিয়া বললেন, বেশ তো মা এস আমার সঙ্গে। তোমার মা-বাবা ভালো আছেন? কবে এসেছ?

বহ্নি বলল, প্রায় দশবার দিন হল। মা-বাবা এসেছিল। তারা তিন-চার দিন থেকে চলে গেছে।

হোসেন মিয়া বহ্নিকে সাথে করে নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে বললেন, তুমি বস আমি তোমার চাচিকে ডেকে দিচ্ছি।

বহ্নি বসে বলল, পরে ডাকবেন। আপনি বসুন, আমি আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

হোসেন মিয়া বসে বললেন, বল মা কি জানতে চাও?

আপনাদের বাড়িতে মানিক বলে যে ছেলেটা থাকেন, তিনি আপনার কে?

মানিক আমাদের আপন কেউ নয়। এমন কি দূর-সম্পর্কেরও কেউ না। তবে সে আপনের থেকে অনেক বেশি। কারো নিজের ছেলেও এরকম হয় না। কেন মা, তার কথা জিজ্ঞেস করছ? তাকে কি তুমি চেন?

বহ্নি বলল, না চাচা চিনি না। এখানে এসে শুনলাম তিনি নাকি রহিম মেম্বার ও তার ছেলের সঙ্গে কি সব ফার্ম-টার্ম করেছেন। গ্রামের লোকের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার

চেষ্টা করছেন। গ্রামের লোকের মুখে তার সুনাম শুনে জানতে ইচ্ছা করল। তাই জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা চাচা, তাকে আপনি পেলেন কি করে?

হোসেন মিয়া সাদাসিধে মানুষ। কবে কিভাবে তিনি মানিককে পেলেন এবং কিভাবে তাদের ছেলের মতো হয়ে এখানে আছে, একে একে সব বললেন।

শুনে বহ্নির মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, উনি এখন ঘরে আছেন?

হোসেন মিয়া বললেন, আছে। তুমি কি তার সাথে দেখা করতে চাও?

বহ্নি বলল, এলাম যখন তখন দেখা করেই যাই।

হোসেন মিয়া 'তানজিলা' বলে ডাক দিলেন।

তানজিলা কে?

আমার শালার মেয়ে।

তানজিলা ভাইয়ার নাশতা নিয়ে যাওয়ার জন্য রান্না ঘরে এসেছিল। ফুপার ডাক শুনে ঘরে এসে বহ্নিকে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

হোসেন মিয়া বললেন, কি রে মা সালাম দিলি না যে?

তানজিলা লজ্জা পেয়ে সালাম দিল।

বহ্নি সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তুমি পড়াশোনা কর?

জি করি।

কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস সিক্সে।

হোসেন মিয়া তানজিলাকে বললেন, যা তো মা, তোর ভাইয়াকে এখানে আসতে বল।

তানজিলা ফুপার কথামতো ডাকতে গিয়ে ভাইয়ার কথা শুনে ফিরে এসে বলল, ওনাকে ভাইয়া তার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছে।

হোসেন মিয়া বহ্নিকে বললেন, তাই যাও মা।

তানজিলা বহ্নিকে মানিকের ঘরের দরজার কাছে নিয়ে এসে বলল, ভাইয়া ভিতরে আছে, আপনি যান আমি আসছি। কথা শেষ করে সে চলে গেল।

বহ্নি দরজার পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, মানিক দরজার দিকে পিঠ করে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সালাম দিয়ে বলল, অতিথি জানালা দিয়ে ঘরে আসে না, দরজা দিয়ে আসে।

মানিক ঘরে সালামের উত্তর দিয়ে বহ্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সুবহান আল্লাহ।

বহ্নি বলল, সালামের উত্তর সাথে সুবহান আল্লাহ বলাও কি ইসলামের নিয়ম?

মানিকের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বলল, না এটা ইসলামের কোনো নিয়ম না। তবে কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটলে বা শুনলে সুবহান আল্লাহ বলতে হয়। এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের গুণগান করা।

বহ্নি বুঝতে পারল, সে আসতে মানিক আনন্দিত হয়েছে। সে কথা ভেবে সেও আনন্দিত হল। তবু জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ কি এমন ঘটনা ঘটল, যার জন্য আল্লাহ পাকের গুণগান করলে?

মানিক বলল, আপনাকে সালাম দিতে শুনে আল্লাহ পাকের গুণগান করলাম। তা হঠাৎ এসে পড়লেন যে?

কেন, আসতে নিষেধ আছে নাকি?

তা থাকবে কেন? বসুন বলে চেয়ারের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করল।

বহ্নি বসে বলল, আমার সামনে চশমা পরার দরকার নেই; খুলে ফেল।

আমি চশমা পরলে আপনার অসুবিধে হয় নাকি?

ছদ্মবেশ আমি পছন্দ করি না। আচ্ছা পান্থ, তোমার এত অহঙ্কার কেন?

আমি পান্থ নই, মানিক। সেভাবেই কথা বলুন। আর অহঙ্কারের কথা বলছেন? অহঙ্কার এবং অহঙ্কারীকে আমি ঘৃণা করি। কোন মানুষেরই অহঙ্কার থাকা উচিত না। অহঙ্কার আল্লাহ পাকের সিফত। অহঙ্কারীর ধ্বংস অনিবার্য। জানেন না, আজাজীল ফেরেশতাদের সর্দার ছিল। ক্বুরআন পাকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ যখন আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)-কে তৈরি করে সমস্ত ফেরেশতামণ্ডলীকে সিজদা করতে বললেন তখন আজাজীল ছাড়া সবাই করল। আল্লাহ আজাজীলকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আদমকে সিজদা করলে না কেন?" আজাজীল অহঙ্কার প্রকাশ করে বলল, "আমি আগুন থেকে তৈরি আর আদম মাটি থেকে। আদমের চেয়ে আমার মর্যাদা বেশি।" আল্লাহ তখন আজাজীলের উপর অভিসম্পাত করলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করে আজাজীল শয়তানে পরিণত হল। তার সমস্ত ইবাদত বন্দেগী বিফল হয়ে গেল। এগুলো ক্বুরআন পাকের কথা। মুসলমান হিসেবে প্রত্যেককে ক্বুরআন বিশ্বাস করতে হবে।

বহ্নি বলল, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোমার ব্যবহারেও তো অহঙ্কার প্রকাশ হতে দেখছি।

মানিক বলল, আপনার সঙ্গে আমার তেমন কোনো পরিচয়ই হয়নি। ব্যবহারের কথা বলছেন কেন? আপনার পান্থর হয়তো তা থাকতে পারে।

যদি বলি তুমিই পান্থ?

আপনি বললেই তো আর আমি পান্থ হয়ে যাব না, মানিকই থাকব।

আচ্ছা, তুমি আমাকে কি মনে কর?

কি আর মনে করব? আপনি মান্যবর নিয়াজ মাতব্বরের নাতনি।

বহ্নি রাগে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, পান্থ, তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

মানিকও একটু রাগ দেখিয়ে বলল, বারবার বলছি আপনি ভুল করছেন। আমি পান্থ নই, মানিক। তবু আপনি আমাকে পান্থ ভাবছেন। আচ্ছা, আপনি এত পান্থ পান্থ করছেন কেন? তার সঙ্গে আপনার বুঝি খুব নিগূঢ় সম্পর্ক ?

এই কথায় বহ্নি মনে ব্যথা পেয়ে ভীষণ রেগে গেল। কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলে আসতে লাগল।

মানিক তার পিছনে পিছনে আসতে আসতে বলল, চলে যাচ্ছেন কেন? শুনুন। আমাকে ভুল বুঝে চলে যাবেন না, প্লীজ। তবু যখন বহ্নি দাঁড়াল না তখন মানিক দ্রুত হেঁটে এসে তার পথ আগলে বলল, এভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? চাচা-চাচি কি মনে করবেন ভেবে দেখেছেন?

বহ্নি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তুমি একটা কাপুরুষ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। অভদ্র ছোটলোক কোথাকার। পথ ছাড়, নচেৎ....বলে থেমে গেল। রাগে কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

মানিক পথ না ছেড়ে বলল, আপনি এই ক'দিন আমার সঙ্গে অভদ্রের মতো আচরণ করলেন, অথচ আমাকেই অভদ্র বলছেন। তারপর এক পাশে সরে গিয়ে বলল, ধরে রাখার যখন অধিকার নেই তখন চলে তো যাবেনই। তাই বলে এভাবে যাওয়াটা কি উচিত হবে? একটা কথা না বলে পারছি না, আপনার পান্থ হয়তো কাপুরুষ, অভদ্র ও ছোটলোক হতে পারে, আমাকে ঐ সব ভেবে ভুল করছেন।

বহ্নি একপলক তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে চলে গেল।

হোসেন মিয়া বহ্নিকে ঐভাবে যেতে দেখে কিছু বলার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর মানিককে একা বেরিয়ে এসে তার সাথে কথা বলতে দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মানিককে একা ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, নিয়াজ মাতব্বরের নাতনি চলে গেল কেন? কিছু নাশতা-পানি করেও গেল না?

মানিক বলল, বড়লোকের নাতনি আমাদের বাড়িতে খাবে কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, দেখা করে চলে গেল।

হোসেন মিয়া আর কিছু বললেন না।

নিয়াজ মাতব্বর প্রবীণ চালাক-চতুর লোক। তিনি এই কয়েকদিনে নাতনির মনোভাব কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন। প্রথম যেদিন বহ্নিকে নিয়ে রহিম মেম্বারের ফার্ম দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন তাকে বারবার মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন। তখন মনে একটু খটকা লেগেছিল। পরে নাতনিকে প্রতিদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে দেরি করে ফিরতে দেখে একদিন বললেন, কি ভাই, শুধু ভ্রমণে যাওয়া হয়, না সেই সাথে অভিসারের কাজটাও সারা হয়?

বহ্নি কুপিত স্বরে বলল, হঠাৎ এ রকম প্রশ্ন করছেন কেন দাদু?

প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে দেরি করে ফিরো; তাই ভাবলাম, গ্রামের কোন ছেলেকে হয়তো তোমার মনে ধরেছে। তার সাথে কথা বলতে বলতে সময়ের জ্ঞান থাকে না।

দেখুন দাদু, এ রকম বাজে কথা বলবেন না। গ্রামে কত ভালো ছেলে যেন রয়েছে?

কত না থাকলেও দু'একজন তো আছে।

তাও নেই। আর থাকলেই বা কি? শহরে কি ছেলের অভাব?

তা অবশ্য নেই। তবে গ্রামের ছেলেদের মতো অত ভালো ছেলে নেই।

এতদিন তো গ্রামে রইলাম, কই, তেমন ছেলে তো একটাও দেখলাম না?

দেখেছ ঠিকই, স্বীকার করছ না।

কাকে দেখেছি বলুন তো?

দাদু একটু চালাকি করে বললেন, কেন রহিম মেম্বারের ছেলে সালেক। তার মতো ছেলে দশ গ্রাম খুঁজলে একটাও পাবে না।

বহ্নি হেসে উঠে বলল, তা অবশ্য ঠিক কথা। কিন্তু বয়স বেশি হয়ে আপনার মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে।

দাদু একটু রাগের ভান করে বললেন, বেশি লেখাপড়া করে ছোট মুখে বড় কথা বলতে শিখেছ, না? লোকে ঠিকই বলে ছেলেমেয়েদের বেশি লেখাপড়া করালে বেয়াদব হয়ে যায়। মুরুব্বিদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না। জান, বিচারের জন্যে এখনও দশ গ্রামের লোকে ডেকে নিয়ে যায়?

বহ্নি হাসতে হাসতে বলল, আমি কোনোদিন আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করেছি? আজ আপনিই তো আমাকে বেয়াদবি করতে শেখালেন। সালেক ভালো ছেলে হলেও সে আমার থেকে অনেক জুনিয়র। তাই তার কথা আপনি যখন বললেন তখন আপনার মাথায় গোলমালের কথা বলেছি। এতে আমার বেয়াদবি হয় কি করে?

দাদু নিজের কথায় নিজে বোকা বনে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, মানিক তো আর জুনিয়র না। দেখতে যেমন তেমনি স্বভাব-চরিত্র। আশপাশের গ্রামের লোকেরাও পর্যন্ত তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মানিকের কথা শুনে বহ্নি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

দাদু বললেন, কি হল ভাই, মানিকের কথা বলতে চুপ করে গেলে কেন? মনে ধরেছে নাকি? যদি তাই হয়, তা হলে ব্যবস্থা করতে পারি।

বহ্নি বলল, যার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, সে আবার ভালো ছেলে। এই কথা বলে সে দিন দাদুর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল।

আজ নিয়াজ মাতব্বর নাতনিকে বেড়াতে গিয়ে বিচলিত অবস্থায় ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ভাই, তোমাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে কারো সাথে ঝগড়া করে এসেছ। উনি তখন নাশতা খাচ্ছিলেন। বললেন, এস নাশতা খাবে এস। খালি পেটে থাকলে রাগ পড়বে না। তারপর স্ত্রীকে বললেন, বহ্নির নাশতা নিয়ে এস।

বহ্নি কোনো কথা না বলে কলতলা থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে দাদুর পাশে মাদুরের উপর বসে পড়ল।

ততক্ষণে বহ্নির দাদি নাশতা এনে তাকে দিল।

বহ্নি চুপচাপ খেতে লাগল।

খাওয়ার পর দাদু বহ্নিকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার বল, কোথায় গিয়েছিলে?

আপনার কথিত সেই সর্বোত্তম ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম।

আলাপ করে কি বুঝলে?

তার মতো অহঙ্কারী , অভদ্র, ছোটলোক ও ইতর ছেলে জীবনে দেখিনি।

অহঙ্কার একটু-আধটু সবারই থাকে। তারও থাকতে পারে। কিন্তু বাকিগুলোর কথা যে বললে, তা আমি বিশ্বাস করি না।

আপনারা তার বাইরেটা দেখেছেন, তাই তাকে চিনতে পারেন নি।

আর তুমি বুঝি ভিতরটা দেখে এসে এসব বলছ? কিন্তু ভাই, কারো ভিতরটা দেখতে হলে দীর্ঘদিন তার সাথে মেলামেশা করতে হয়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মানিকের সঙ্গে তোমার অনেক আগে থেকে পরিচয় আছে?

শুধু পরিচয় নয়, আমরা একসঙ্গে কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়েছি। তাকে আমি যতটা জানি, তা আর কেউ জানে না।

তা হলে তো তুমি তার সব জান?

জানব না কেন? তার বাবার মতো ধনী লোক খুব কম আছে। বিরাট ব্যবসায়ী ঢাকায় যে কতগুলো বাড়ি আছে তা বলা কঠিন। দুটো গাড়ি। মানিক বাবা-মা। একমাত্র সন্তান। তাই সে এই রকম। জানেন দাদু, ছদ্মবেশে থাকলেও আমি তা ক প্রথম দিন দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু সে কথা বলার পর সে কিছুতেই স্বীকার ক ল না। বলল, "আপনি ভুল করছেন। অনকে সময় অনেকে একইরকম দু'জন কে ে খে ভুল করে। আপনিও করছেন। আমি পান্থ নই মানিক।" কিন্তু আমি হলফ করে ব তে পারি, পান্থ নাম বদল করে ছদ্মবেশে এখানে আছে।

দাদু বললেন, তা হলে মানিকের আসল নাম পান্থ? তাই তো ভাবি, যে ছেলে চাকরি করে, সে গরিবদের এত সাহায্য করে কি করে? এখন তোমার কথা শুনে সবকিছু বুঝতে পারলাম। তবে তুমি যে সব কথা বলে গালাগালি করলে তা ঠিক মনে নিতে পারছি না। যে নাকি গরিবদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল এবং দেশ ও দশের উন্নতির জন্য বড়লোকের একমাত্র ছেলে হয়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকে, সে কোনোদিন ঐ রকম হতে পারে না। ছদ্মবেশে থাকার নিশ্চয় কোনো কারণ আ ছ। আমার যতদূর মনে হয়, তোমার সঙ্গে তার কোনো ব্যাপারে মনোমালিন্য আছে। ার ফলে তোমাকে সে ধরা দিতে চাচ্ছে না। আর সেজন্যেই তুমি তাকে ঐসব বলছ।

বহ্নি বলল, তার সাথে আমার মনোমালিন্য থাকবে কেন? সে বরাবরই ঐ রকম।

দাদু বললেন, তাকে যদি বরাবরই ঐ রকম জেনে থাক, তা হলে তোমাদে দু'জনের মধ্যে মনের ব্যাপারে কিছু একটা গোলমাল বেধে আছে। যার জন্য দু'জন দু'জনের কাছে সহজ হতে পারনি। আমার আরো মনে হচ্ছে, তুমি তাকে যা ভাব, সেও তোমাকে তাই ভাবে।

বহ্নি দাদুর কথায় রেগে গেলেও হেসে ফেলল। বলল, আপনি দেখছি সাইকোলজিস্টের মতো কথা বলছেন। কিন্তু সে যে কত বড় ইতর তা যদি জানতেন, তা হলে ঐ কথা বলতেন না।

দাদু বললেন, সে কি এমন ইতরামি করেছে বল তো শুনি?

বহ্নি রেবেকার প্রেম-কাহিনী বলে বলল, জানেন দাদু, মেয়েটা কলেজ লাইফ থেকে তাকে ভালবাসত। একসঙ্গে খেলত, বেড়াত। তাদের বাড়িতেও অসংখ্যবার গেছে। কিন্তু ভার্সিটিতে পড়ার সময় রেবেকার যখন বিয়ের কথা উঠল তখন সে পান্থকে তার ভালবাসার কথা জানিয়ে প্রেম নিবেদন করল। পান্থ তাকে বিদ্রে করল। বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি না। অন্যান্য গার্লফ্রেণ্ডদের মতো মনে করি। অথচ রেবেকা কোনো অংশে তার অনুপযুক্ত ছিল না। সে আমারও বান্ধবী ছিল। সে যে

পান্থকে ভালবাসত তা আমাকে বলেছিল। পান্থ প্রত্যাখান করার পর রেবেকা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা আমাকে বলেছে। শেষে রেবেকার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল।

দাদু গভীর মনোযোগ দিয়ে নাতনির কথা শুনলেন। সে থেমে যেতে বললেন, তোমার কথা শুনে পান্থর প্রতি আমার ধারণা আরো উচ্চ হয়ে গেল।

মানে?

মানেটা তুমি বুঝতে না পারলেও আমি পেরেছি। বলছি শোন, রেবেকা পান্থকে ভালবেসেছিল; কিন্তু পান্থ তো রেবেকাকে ভালবাসেনি? যাকে ভালবাসতে পারেনি তাকে বিয়ে না করে সে ঠিকই করেছে। যদি করত, তা হলে দু'জন কোনোদিন সুখী হত না। পান্থ যে কথা রেবেকাকে বলেছে এবং তুমি আমাকে তার সম্বন্ধে যে সব কথা বললে, সেসব শুনে আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, পান্থ ও তোমার মধ্যে বাহ্যিক মনোমালিন্য; কিন্তু মনে মনে দু'জন দু'জনকে ভালবাস।

বহ্নি বেশ রাগের সঙ্গে বলল, আপনার সাইকোলজি ভুল। আমি তাকে ঘৃণা করি।

কাউকে ভালবাসলে তাকেই ঘৃণা করা যায়। নচেৎ কেউ কাউকে শুধু ঘৃণা করে না।

বহ্নি আরো রেগে গিয়ে বলল, আপনি সহজ কথাকে পেঁচিয়ে অন্য কথা বলছেন। আমি পান্থকে প্রথম থেকেই ঘৃণা করি এবং আজও করি।

দাদু বললেন, কেউ যদি কাউকে সত্যিকার ঘৃণা করে, তা হলে সে কোনোদিন তার ধারে-কাছে যায় না। তার কথা আলোচনা করা তো দূরের কথা; তার নামও শুনতে চায় না। তুমি কিন্তু তা করছ না। বরং পান্থকে নিয়ে বেশ ইন্টারফেয়ার করছ। আর তোমার রেগে যাওয়াটা অন্য কিছু প্রমাণ করছে।

বহ্নি নিজের কথার জালে জড়িয়ে কোনো উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু রেগে গেল। রাগের সঙ্গেই বলল, আমি কাউকে নিয়ে ইন্টারফেয়ার করি না। বরং আপনিই করেন। তারপর সেখান থেকে চলে যেতে যেতে বলল, গ্রামে বেড়ানোর শখ মিটে গেছে, তাড়াতাড়ি শহরে যেতে পারলে বাঁচি।

দাদু শুনে মুচকি হাসলেন, কিছু বললেন না।

বহ্নি রুমে এসে গাড়ি পাঠাবার জন্য বাবাকে চিঠি লিখতে বসল।

নিয়াজ মাতব্বরের এক চাচাতো ভাই আবুলের নাতনির বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। মেয়েটির নাম লতিফা। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তার বাবা নেই। এতিম মেয়েকে দাদা আবুল মানুষ করে বিয়ে দিচ্ছেন। আবুলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। নাতনিকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়িয়ে আর পড়াতে পারেন নি। লতিফার বয়স বিশ-একুশের মতো। তার বিয়ে দেয়ার জন্য আবুল অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছেন। কিন্তু পাত্র পক্ষের চাহিদা জেনে তা সম্ভব হয়নি। এবারে একটা ছেলে পেয়ে আবুল আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যে লতিফার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। যারা তাকে সাহায্য করছেন তাদের মধ্যে নিয়াজ মাতব্বর প্রধান। উনিই উদ্যোগ নিয়ে এই কাজ করাচ্ছেন। সকলের থেকে টাকাও বেশি দিচ্ছেন। রহিম মেম্বারও বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। মানিককে নিয়াজ মাতব্বর নিজে বিয়েতে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন।

বহ্নি আগে থেকে লতিফাকে জানলেও লতিফা ছোট বলে তার সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেনি। এবার এসে তার সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলেছে। অনেক সময় তাদের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করে। লতিফাও মাঝে মাঝে বহ্নিদের বাড়িতে আসে। তার বিয়ের কথা শুনে বহ্নি ভেবে রেখেছে নিজের আংটিটা তাকে প্রেজেন্ট করবে।

পাত্রের বাড়ি দিনাজপুর টাউনে। পাত্র এস.এস.সি পাস করার পর একটা কঠিন অসুখে পড়েছিল। সেই থেকে তার একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে। কোনো কাজকর্ম করতে পারে না। দেখতে যাই ছিল না কেন, অসুখে ভুগে ভুগে এখন তার মুখের শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। রোগা পাতলা। গায়ের রং কালো। বয়স প্রায় ত্রিশের মত। চিররুগ্ন। তাই তার বাবা তাকে বাজারে একটা দোকান করে দিয়েছেন। পাত্রের বাবা চাষবাস নিয়ে থাকেন। নিজের বেশি জমি জায়গা নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে কোনোরকমে সারা বছরের খোরাকির ব্যবস্থা করেন। এই রমক অবস্থার লোক হয়েও ছেলের বিয়েতে নদগ বিশ হাজার টাকাসহ পাঁচ ভরি সোনার জিনিসের দাবী করেছিলেন এবং একশো জন বরযাত্রী আসার কথা বলেছিলেন। নিয়াজ মাতব্বর মেয়ের দাদার আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে অনেক অনুরোধ করে পনের হাজার টাকা, তিন ভরি সোনা ও পঞ্চাশ বরযাত্রীতে রাজি করিয়েছেন।

আজ বিয়ের দিন। বর ও বরযাত্রীরা এসে গেছে। বর দেখে সবাই অবাক। অনেকে আবুলকে বললেন, এত সুন্দর মেয়েকে একটা মরার সঙ্গে এত খরচ করে বিয়ে দিচ্ছেন। ছেলে কি আর খুঁজে পেলেন না?

আবুল তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মজলিসে এসে বর দেখে বললেন, আমরা তো এই ছেলের জন্য বিয়ের কথা বলিনি। এর বড় ভাইয়ের জন্য বলেছি। তারপর যে দু'তিনজন আত্মীয়কে নিয়ে ছেলে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে ঘটনাটা জানালেন। তারাও বর দেখে একই কথা বললেন। আবুল বরের বাবাকে বললেন, আপনার বড় ছেলে কোথায়? আমরা তো তাকে দেখে পছন্দ করেছি।

ছেলের বাবার নাম নুরুদ্দিন। তিনি বললেন, এটাই তো আমার বড় ছেলে। যার কথা বলছেন, সে এর ছোট। কাল থেকে অসুস্থ, তাই আসেনি।

আবুল বললেন, আপনারা এই ছেলের কথা বলেন নি। ছেলে দেখবার সময় এই ছেলে তার সাথে ছিল। আমরা সেই ছেলেকে জিজ্ঞেস-পড়া করেছি। সে আমাদের কথার উত্তরও দিয়েছে। তখন কেন আপনারা বললেন না, ঐ ছেলে নয় এই ছেলে?

আসলে এটা ছেলের বাবার চালাকি। বড় ছেলে রোগা ও চিররুগ্ন বলে তার বিয়ে হচ্ছিল না। এদিকে মেজ ছেলে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। সে কালো হলেও স্বাস্থ্য ভালো। খুব কর্মঠ। এস.এস.সি. পাস করে বাবার সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজ করে। অন্য এক জায়গা থেমে মেয়ের বাবা লোকজন নিয়ে এসে বড় ছেলেকে দেখতে এসে মেজকে পছন্দ করে। তারপর লেনদেনের কথা বলে বিয়ের দিন ঠিক করে গেছে। তারা অনেক নগদ টাকা ও সোনার জিনিস দিবে। নুরুদ্দিন প্রথমে বড় ছেলের কথা বলেন। তারা রাজী হয়নি। শেষে টাকা ও সোনাদানার লোভে মেজ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হন। দিন ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তারা চলে যেতে নুরুদ্দিন স্ত্রীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ঘটক লাগিয়ে এখানে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আবুল ঘটকের কথায়

দু'তিনজন আত্মীয়কে নিয়ে যখন ছেলে দেখতে গেল তখন নুরুদ্দিন বড় ছেলেকে বলল, তোর সাথে মেজ থাকবে। মেয়ে পক্ষের লোকেরা যাই কিছু জিজ্ঞেস করুক না কেন, তুই কোনো উত্তর দিবি না। যা বলার তোর মেজ ভাই বলবে। সে কথা নুরুদ্দিন মেজ ছেলেকেও বুঝিয়ে বললেন। তাই আবুলরা যখন যা কিছু জিজ্ঞেস করছিলেন তখন মেজ ছেলেই উত্তর দিয়েছিল। তা ছাড়া দু'ভাই একসাথে থাকলে সবাই মেজকেই বড় বলে ভাববে। আবুলরাও সেই ভুল করেছেন। নুরুদ্দিনের চালাকি তারা ধরতে পারেন নি। মেজ ছেলেকেই তারা পাত্র ভেবে বিয়ের কথাবার্তা বলেছেন। সেই জন্যে নুরুদ্দিন মেজ ছেলেকে আনেন নি। মিথ্যে করে বললেন, সে অসুস্থ। আবুল ও গ্রামের সবাই বেঁকে বসল। তারা বলল, এই মরার সাথে লতিফার বিয়ে আমরা দেব না। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, বিয়েতে ছেলে বদলের কথা আমরা কখনও শুনিনি। বরং মেয়ে বদলের কথা অনেক শুনেছি। এই নিয়ে মজলিসে ভীষণ গণ্ডগোল সৃষ্টি হল। গ্রামের কিছু ছেলে-ছোকরা বরের বাবাকে মারধর করার প্রস্তুতি নিল।

নিয়াজ মাতব্বর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অন্যান্য মুরুব্বিদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথমে সেসব ছেলে-ছোকরাদের কন্ট্রোল করলেন। তারপর বরের বাবাকে বললেন, আপনার চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। আপনি এক কাজ করুন, আপনার মেজ ছেলেকে নিয়ে আসুন। আমরা ঘটনাটা চেপে গিয়ে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলব।

নুরুদ্দিন বললেন, তা কি করে হয়? তার অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পরে দিন। তা ছাড়া তারা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি টাকা ও সোনা দিচ্ছে। আমার এই ছেলে একটু রোগা বলে আপনাদের মেয়ের সঙ্গে এক রকম সস্তায় বিয়ে দিচ্ছি। নচেৎ কি আর রাজি হতাম?

নিয়াজ মাতব্বর বুঝতে পারলেন, লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি লোভী। তার কথা শুনে খুব রেগে গেলেও ধৈর্য হারালেন না। গম্ভীর স্বরে বললেন, যদি মারধর খাওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তবে কোনো উচ্চবাচ্য না করে যত তাড়াতাড়ি পারেন মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে যান। নচেৎ গ্রামের ছেলেরা মারধর করে বিদেয় করবে।

নুরুদ্দিন খুব অপমান বোধ করে ভীষণ রেগে গেলেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করে চুপচাপ সবাইকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

এদিকে মেয়েমহলেও কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। তারাও বর বদলের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল।

বর ও যাত্রীরা চলে যাওয়ার পর আবুল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। চিন্তা করতে লাগলেন, এরপর লতিফার বিয়ে দেবেন কি করে? ঘরের ভিতর লতিফার দাদিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পাড়ার মেয়েরা বলতে লাগল লতিফার আর বিয়ে দেয়া খুব মুশকিল হবে।

নিয়াজ মাতব্বর চুপ করে বসে থাকলেন না। তিনি সবকিছু চিন্তা করে গ্রামের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা তো বর তাড়িয়ে দিলেন। এখন কনের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন। পরে অন্য কোথাও বিয়ে দেয়া যে খুব মুশকিল তা আপনারা জানেন। আশা করব আপনাদের মধ্যে কেউ-একজন লতিফাকে তার ছেলের বৌ করার জন্য এগিয়ে আসবেন।

ওঁর কথা শুনে লোকজনের মধ্যে বেশ গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিল না।

নিয়াজ মাতব্বর আবার বললেন, আপনারা এই গ্রামেরই মানুষ। লতিফার মতো মেয়ে আশপাশের কয়েকটা গ্রামে যে নেই তা জানেন। তবে সে এতিম। একটা এতিম মেয়ের জন্য আপনাদের মনে কোনো দয়া হচ্ছে না? এতিমকে দয়া দেখাতে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) বলেছেন।

জমির সেখের এক ছেলে। তিন মেয়ে। মেয়ে তিনটে বড়। তিনি জমি বেঁচে বড় ঘরে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। জমির ছেলেকে আই.এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন। সে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে। জমির সেখের ইচ্ছা, তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যা জমি বেঁচেছেন, ছেলের বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের বাপের কাছ থেকে তা আদায় করবেন। তিনি এগিয়ে এসে নিয়াজ মাতব্বরকে বললেন, আমি লতিফাকে ছেলের বৌ করতে পারি। আমাকে ত্রিশ হাজার টাকা নগদ ও ছেলেকে ঘড়ি, সাইকেল, আংটি, বোতাম এবং মেয়েকে, কানে, হাতে ও গলায় সোনার গহনা দিতে হবে। আর একটা রেডিও সহ ভালো টেপ দিতে হবে। নগদ টাকা বেশি চাইতাম, এতিম মেয়ে বলে কম করে চেয়েছি।

নিয়াজ মাতব্বর লোকটার স্পর্ধা দেখে রেগে গেলেন। রাগটা সামলে নিয়ে বললেন, ছেলের বাবা হয়ে নিজেকে কি ভাবেন জানি না। কিন্তু মেয়ের সবকিছু জেনেও যে এমন অমানুষের মতো কথা বলবেন, তা ভাবতেই পারছি না। লতিফার দাদার যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে আপনার মতো অমানুষের ছেলের সঙ্গে এতকিছু দিয়ে বিয়ে দিতে যাবে কেন? আপনার ছেলের চেয়ে হাজার গুণ ভালো ছেলের সাথে এতদিন বিয়ে দিয়ে দিত। আমার প্রথম ও শেষ কথা, এই ছেলেকে যা কিছু দেয়ার কথা ছিল, তাই পাবেন। চিন্তা করে দেখুন করাবেন কিনা।

নিয়াজ মাতব্বর অমানুষ বলাতে জমির সেখ খুব রেগে গিয়ে বললেন, আমারও এক কথা, আমার কথার নড়চড় হবে না। মেয়ের দাদা পারলে দেবেন, না পারলে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করবেন।

মানিক বিয়ে খেতে এসেছিল। সে প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় খুব দুঃখ পেল। ভাবল, প্রথম পক্ষ ধূর্ত ও লোভী। আর দ্বিতীয় পক্ষ অমানুষ ও লোভী। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। লতিফার ভবিষ্যৎ ভেবে মানিকের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। জমির সেখকে চলে যেতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দাঁড়ান, যাবেন না। তারপর নিয়াজ মাতব্বরের কাছে এসে বলল, আপনাদের অনুমতি পেলে আমি ছেলের বাবার সমস্ত দাবীদাওয়া পূরণ করব।

মানিকের কথা শুনে জমির সেখ দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন তার মুখে হাসি ফুঠে উঠল। আর গ্রামের লোকেরা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা শুনেছিল, মানিক বিদেশ থেকে অনেক টাকা এনেছে। সেই টাকায় হোসেন মিয়ার ঘরের পাশে এক কামরা পাকা ঘর করে তাতে থাকে। এখন রহিম মেম্বারের ফার্মে চাকরি করে। সে কি করে জমির সেখের এত দাবী-দাওয়া দিবে? সেই কথা ভেবে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

কেউ কিছু বলছে না দেখে মানিক আবার বলল, আপনারা কিছু বলছেন না কেন? মনে হচ্ছে, আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তা হলে শুনুন, বিয়ে পড়াবার আগেই ত্রিশ হাজার টাকা এবং সেই সাথে ছেলেমেয়ের জিনিসপত্র কেনার জন্য আপনারা পাঁচজনে যা বলবেন সেই টাকাও দিয়ে দেব।

সালেক বলল, আমি তোমার কথায় ভেটো দিচ্ছি। কারণ ইসলামে বিয়ের সময় দাবী-দাওয়া করা সরাসরি হারাম।

মানিক বলল, তা আমিও জানি। কেন দিচ্ছি তা তোমার সাথে পরে আলোচনা করব। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বলল, আমি সবকিছু দেব ঠিক কথা; কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

নিয়াজ মাতব্বর এতক্ষণ চুপ করে মানিকের উদারতার কথা চিন্তা করছিলেন। এবার বললেন, বেশ, তুমি কি বলতে চাও বল।

মানিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আমি যে কথাগুলো বলব, তা মেয়েদেরও শোনা উচিত। তারপর বহ্নির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি দয়া করে সব মেয়েদেরকে বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়াতে বলুন।

লতিফার বিয়ের জন্য মানিক এত টাকা দেবে শুনে বহ্নিও খুব অবাক হয়ে এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মানিকের কথা শুনে ঘরে গিয়ে মানিকের টাকা দেয়ার কথা বলে মেয়েদেরকে বেড়ার কাছে নিয়ে এসে মানিক কি বলে শুনতে বলল।

মানিক সেদিকে একবার তাকিয়ে বলতে শুরু করল, আজকাল শহর ও গ্রামের অনেক লোকেরা টাকার অভাবে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছে না। একথা আমরা সবাই জানি। আমার প্রশ্ন হল, মেয়েদের বিয়ে দিতে টাকা লাগবে কেন? বরং ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে বিয়ের খরচপত্র দিয়ে এবং মেয়েকে গহনাপত্র পরিয়ে বৌ করে নিয়ে আসবে। মেয়ের বাবার যতটুকু সামর্থ্য তা মেয়ে জামাইকে সন্তুষ্টচিত্তে দিবে–এটাই হওয়া উচিত। অবশ্য আগের যুগের তাই নিয়ম ছিল। আমার কথা শুনে ছেলের বাবারা রাগ করবেন না। কেন এই কথা বললাম, বললে তা বুঝতে পারবেন। আমরা বাজার করতে গেলে অথবা ঘরের কোনো আসবাবপত্র কিনতে গেলে টাকা দিয়ে কিনে আনি, না দোকানদার বাজার বা আসবাবপত্র দেয়ার সাথে তার মূল্যও দিয়ে দেন? কথাটা আমি খুব বোকার মতো বলে ফেললাম তাই না? কথাটা এই বোকার কাছ থেকে শুনলেও চিন্তা করে দেখুন, যখন সামান্য বাজার বা আসবাবপত্র টাকা দিয়ে কিনতে পারেন তখন কন্যা, জায়া ও জননী ঘরে আনার সময় এর উল্টো করেন কেন? তা হলে কি তারা পুরুষদের কাছে বাজারের আনাজপাতি বা ঘরের আসবাবপত্রের চেয়ে খারাপ বস্তু? এত খারাপ যে, তাদেরকে আনার সময় তাদের গার্জেনদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ও সোনাদানা দাবি করে নিয়ে আসেন। কন্যা, জায়া ও জননীদের গার্জেনদের পথের ভিখারী করতে ছেলে বা ছেলের অভিভাবকরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। বাবারা মেয়েদেরকে খাইয়ে-পরিয়ে এবং যারা পারেন তারা লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেন। তারপরও পাত্রপক্ষের দাবী-দাওয়া পূরণ করতে না পেরে তাদের বিয়ে দিতে পারছেন না। এটা একদিকে যেমন খুব দুঃখের ব্যাপার; অন্যদিকে তেমনি ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। আপনারা কি একটুও চিন্তা করেছেন, সবারই তো মেয়ে অথবা

বোন আছে; তাদের বিয়ে দেয়ার সময়ও তো টাকা-পয়সা, সোনাদানা লাগবে। তা হলে ছেলের বা ভাইয়ের বিয়ে দেয়ার সময় কি করে দাবী-দাওয়ার কথা বলেন? এই দাবী-দাওয়া ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কত বড় অপরাধ, তা যদি আমরা মুসলমান হয়ে চিন্তা না করি, তবে কারা করবে? যে সব যুবতী মেয়েদের টাকার জন্য বিয়ে হচ্ছে না , তারা যেমন দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে তেমনি তাদের মা-বাবারাও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। প্রথমত, মুসলমানদের জন্য বিয়ের সময় দাবী-দাওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে আত্মীয়তা করবেন তাকে দাবী-দাওয়া দিয়ে জমি বেচাতে বা ঋণগ্রস্ত করাতে বাধ্য করানো কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েজ না। এটা ইসলামিক আইনে জঘন্য অপরাধ। এর জন্য আখেরাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, বিয়ের পর স্বামী নানান অজুহাত দেখিয়ে স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য। এমনও শোনা যায়, স্ত্রী টাকা আনতে না পারলে স্বামী তার উপর নির্যাতন চালায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। অনেক স্বামী চার-পাঁচ ছেলের মা হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। আরও শোনা যায়, স্বামী তার মা ও বাবার সহায়তায় স্ত্রীকে নির্যাতন করতে করতে মেরে ফেলছে। তারপর টাকা ও সোনাদানার লোভে অন্য মেয়েকে আবার বিয়ে করছে। সরকার আইন করেও এর কোনো সুরাহা করতে পারেনি। এসবের একমাত্র কারণ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। তাদের মধ্যে অনেকে নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, আবার ধনীরা জাকাত দিচ্ছে, হজ্বও করছে। কিন্তু হালাল-হারামের বাছ-বিচার করছেন না। তারা কি জানেন, হারাম খেলে কোনো এবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। যারা এসব অমানবিক কাজ করেন তারা মুসলমান সমাজে নরকের কীটের মতো ঘৃণ্য। যারা মুসলমান হয়েও অমুসলমানের মতো কাজ করে তারা মুনাফেক। তাদের জন্যই মুসলমান সমাজের এত অবনতি। যারা শুধু মুখে ক্বুরআন-হাদিস আওড়ায়, আর নিজেরা সেসব মেনে চলে না, তারাই মুসলমানদের উপর আল্লাহর গজব ডেকে আনছে। ধর্মের বুলি ছাড়া মুসলমানরা আজ কর্মবিমুখ, তাই সারা বিশ্বের মুসলমানরা বিজাতীয়দের কাছে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। এতসব দেখে শুনেও কি আমাদের জ্ঞানের চোখ খুলবে না? যে সব মেয়েরা স্বামীর ঘরে অত্যাচারিত হচ্ছে, তারা আমাদের কারো-না-কারো মেয়ে অথবা বোন। যাদের মেয়ে বা বোন অত্যাচারিত হচ্ছে তারাই আবার ছেলের বা ভাইয়ের বিয়ের সময় টাকা-পয়সা সোনাদানার দাবী করছে। এটা কোনো মানুষের কাজ কিনা চিন্তা করুন। আমরা কি মুসলমান বলে দাবী করতে পারি? না আমরা মুসলমান থাকব? যেখানে আমাদের নবী করীম (দঃ) বলেছেন, "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।" সেখানে ভাই হয়ে ভাইকে বিপদগ্রস্ত করি কি করে? নবী করীম (দঃ) আরো বলেছেন, "খবরদার তোমরা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" এবার চিন্তা করুন, আমরা কি বিয়ের সময় মেয়ের বাবার কাছ থেকে দাবী-দাওয়া নিয়ে অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ গ্রহণ করছি না? আমরাই আবার তাঁর উম্মত বলে বড়াই করি। কিয়ামতের দিন তাঁর সাফায়াত কামনা করি। ধিক আমাদের জীবনকে! তবে হ্যাঁ, যদি কেউ তার মেয়ে জামাইকে খুশি হয়ে সামর্থ অনুযায়ী কিছু দেয়, তা হলে তা হারাম হবে

না। তবু এটা যতটা সম্ভব গোপনে দেয়া উচিত। তা না হলে তাদের দেখাদেখি অন্যরাও লোভের বশবর্তী হয়ে মেয়ের বাবার কাছে দাবী করবে।

এবার আমি মা-বোনদের কিছু কথা বলব। আপনাদেরকে আল্লাহ পাক অনেক অধিকার দিয়েছেন। সেগুলো আপনারা জানার চেষ্ঠা করুন। সে সবের মধ্যে একটা হল– দেনমোহর। বিয়ের সময় যত টাকাই দেনমোহর বাঁধা হোক না কেন; তার পুরোটাই আপনাদের নিজস্ব। তাতে স্বামীর এতটুকু হক নেই। সেটা আদায় করার জন্য স্বামীর উপর জোর খাটাবার অধিকার আল্লাহ পাক স্ত্রীদের দিয়েছেন। দেনমোহরের টাকা না দিলে স্ত্রীর আপত্তি থাকলে স্বামী তার উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এমন কি স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে দেহদান করতে নাও পারেন। সে অধিকারও আল্লাহ মেয়েদেরকে দিয়েছেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সর্ম্পক গড়ার জন্য আল্লাহ পাক স্ত্রীদের বলেছেন, "তোমরা যদি তোমাদের স্বামীকে সন্তুষ্টচিত্তে দেনমোহরের টাকা মাফ করে দাও, তা হলে সেটাও উত্তম।" স্বামীরা এত নীচ যে, মিষ্টিমুখে স্ত্রীকে ভুলিয়ে দেনমোহরের টাকা মাফ করিয়ে নেয়। তারপর স্ত্রীর উপর চালায় নির্মম অত্যাচার। ইচ্ছামতো তালাক দিচ্ছে, টাকা ও নতুন নারীদেহ ভোগ করার লালসায় একাধিক বিয়ে করছে। মনে রাখবেন, আল্লাহ ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-মূর্খ কাউকেই বিনা বিচারে ছেড়ে দেবেন না। সে জন্য তিনি প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কার্যকলাপ দু'জন ফেরেশতার দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। মা-বোনদের কাছে আমার অনুরোধ, ছেলেরা যদি আপনাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে দাবী-দাওয়া (যা নাকি হারাম) আদায় করতে পারে, তা হলে আপনারাই বা কেন দেনমোহরের টাকা (যা নাকি আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী আপনাদের ন্যায্য পাওনা) মাফ করবেন? কখনও তা করবেন না। স্বামীরা যখন আপনাদেরকে বাবার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে আসতে বলবে তখন আপনারা বলবেন, মজলিসে সবার সামনে আপনি যে টাকা দেনমোহর দেবেন বলে ওয়াদা করে আমাকে বিয়ে করেছেন, সেই টাকা আগে আমাকে দিন। এ কথা বললে হয়তো আপনাদের উপর অত্যাচার আরও বেড়ে যাবে। এমন কি তালাকও দিতে পারে। তবু আপনারা অটল থাকবেন। এমনিতে তো অত্যাচারিত হচ্ছেন বা তালাক পাচ্ছেন। প্রথম দিকে এরকম হলেও পরে যখন ক্রমশ এর প্রসার বাড়বে তখন আস্তে আস্তে স্বামীরা তাদের ভুল বুঝতে পারবে। আর আপনারা যারা অবিবাহিত আছেন, তারা তাদের বাবা বা ভাইদের বলে দিন, যে ছেলে দাবী-দাওয়া করবে, তার সঙ্গে বিয়ে বসবেন না। একথায় ভাববেন না যে, আপনাদের বিয়ে হবে না। কারণ মেয়েদের যেমন পুরুষ না হলে চলে না, তেমনি পুরুষদেরও মেয়ে না হলে চলে না। তা ছাড়া মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সহ্য কম। মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই বিয়ের জন্য বেশি লালায়িত। তবে কেন ছেলেদের দাবী-দাওয়ার কাছে আপনারা নতি স্বীকার করবেন?

আর আমি বেশি কিছু বলব না। শুধু নারী-পুরুষ সবাইকে বলব? যেন আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করে সেইমত চলার চেষ্টা করবেন এবং ইসলামের পরিপন্থী যে কোনো কাজ পরিহার করবেন। আর যা কিছু করবেন, আল্লাহকে হাজীর-নাজীর জেনে করবেন। তা

হলে মুসলমানরা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। সমাজের এ জঘন্যতর পণপ্রথাও লোপ পাবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সবকিছু বুঝার ও আমল করার তওফিক দিন, এই প্রার্থনা করে শেষ করছি।

মানিক থেমে যাওয়ার পর নিয়াজ মাতব্বর বললেন, মানিক খুব খাঁটি কথা বলেছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে ওয়াদা করি, ছেলের তরফ থেকে আর কোনো দাবী-দাওয়া করব না। আর ছেলেরাও করবে না। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, আপনারা কিছু বলছেন না কেন? আপনারা কি নবী করীম (দঃ)-এর উম্মত নন? কিয়ামতের সময় তাঁর সাফায়াত পেতে চান না? আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) হুকুম কি মেনে নিতে পারছেন না? কবর ও হাশরকে কি ভয় করেন না?

এবার সবাই সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ করি। আমরা এখন থেকে কুরআন-হাদিস মোতাবেক ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেব। আল্লাহর হুকুম মেনে চলার চেষ্টা করব।

মরুব্বিদের অনেকে 'মারহাবা, মারহাবা' ধ্বনি দিলেন। কিন্তু দু'চারজন সবার অলক্ষে মজলিস্ থেকে চলে গেলেন। তাদের মধ্যে জমির সেখও ছিলেন।

সবাইকে চুপ করতে বলে নিয়াজ মাতব্বর জমির সেখের খোঁজ করে তাকে পেলেন না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জমির সেখ টাকা ও সোনাদানার লোভে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মানিকের মুখে হাদিস-কালাম শুনে লজ্জা পেয়ে চলে গেছেন। এখন আপনাদের মধ্যে কেউ কি আছেন, যিনি লতিফাকে ছেলের বৌ করে ঘরে নেবেন? মজলিসে আবার গুঞ্জন শুরু হল।

জমির সেখ চলে গেলেও তার ছেলে গজনবী ছিল। সে বলল, মানিক সাহেব যখন হাদিস-কালাম শুনিয়ে গরিব মেয়েদের উপকার করতে চাচ্ছেন তখন উনিই লতিফাকে বিয়ে করে তার প্রমাণ করুক।

মানিক কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে গজনবীর দিকে তাকিয়ে বলল, কথাটা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লতিফার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরপরই তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব আমি নিজেই দিতাম। কিন্তু কয়েক বছর আগে থেকে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি। সেই মেয়েটিও আমাকে ভালবাসে, আমাদের বিয়ে না হলেও প্রথম থেকে দু'জন দু'জনের কাছে উৎসর্গীকৃত। অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যেত। আমি এই এলাকার সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় তা হয়নি। এখন আপনারাই বলুন, আমার কি লতিফাকে বিয়ে করা উচিত?

কেউ কিছু বলার আগেই সালেক তার আব্বাকে বলল, আপনি সবাইকে জানিয়ে দিন, এই মজলিসে, আপনি লতিফাকে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলবেন।

রহিম মেম্বার ছেলের কাছ থেকে একথা শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। খুশি হয়ে তিনি উচ্চস্বরে বললেন, আপনারা বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করুন। আমি এই মজলিসেই বিনা দাবীতে লতিফার সাথে সালেকের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে যাব।

রহিম মেম্বারের কথা শুনে নিয়াজ মাতব্বর ও আরও অনেকে আলহামদুলিল্লাহ বলে কয়েকবার 'মারহাবা, মারহাবা' বললেন। তারপর নিয়াজ মাতব্বর আবুলকে বললেন, দেখলে ভাই, আল্লাহ পাকের কি অপূর্ব কুদরত? তোমার নাতনির রাজটীকা। আর তুমি কিনা একটা বাজে লোকের বাড়িতে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। একেই বলে ভাগ্য। যাও, এবার তাড়াতাড়ি বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা কর।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর খাওয়ার ব্যবস্থা হল। তারপর রহিম মেম্বার বৌ নিয়ে ঘরে ফিরলেন। পরের দিন তিনি গ্রামের লোকজনদের ওলিমার দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন।

বহ্নিও দাদুর সঙ্গে ওলিমা খেতে এসেছে। এক ফাঁকে লতিফাকে একাকী জিজ্ঞেস করল, কি রে, সালেককে তো তুই আগের থেকে চিনিস। বর হিসাবে কেমন লাগছে?

লতিফা লজ্জা পেয়ে শুধু বলল, ভালো।

বহ্নি বলল, সে যে ভালো তা আমিও জানি। স্বামী হিসাবে কতটা ভালো তাই জানতে চাচ্ছি। অবশ্য এক রাতে আর কতটা বুঝবি? তবু একটু-আধটু তো বুঝেছিস?

লতিফা বলল, বলতে আমার খুব লজ্জা হচ্ছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তাকে পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

বহ্নি বলল, আর কিছু বলার দরকার নেই। আমি এটাই আশা করেছিলাম। আল্লাহ্ তোদেরকে সুখী করুক, এই কামনা করি। গতকাল বিয়ে ভেঙে যেতে যা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। যাক, তোর ভাগ্য খুব ভালো, তাই এরকম হল। এখন যাই, দাদু অপেক্ষা করছে। পরে আবার আসব।

বহ্নি গতকাল মানিকের উন্নত মনের পরিচয় পেয়ে খুব মুগ্ধ হয়েছে। সে অনেক দিন থেকে একটা মেয়েকে ভালবাসে শোনার পর থেকে চিন্তা করছে, সেই মেয়েটা কে হতে পারে, যে নাকি তাকেও ভালবাসে? বহ্নির মন বলে উঠল, সে মেয়ে তুমি। তোমাকেই সে কলেজ জীবন থেকে ভালবাসে। সেই জন্যে সে রেবেকাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বহ্নি নিজের মনকে বলল, কিন্তু আমি যে তাকে ভালবাসি, সে কথা জানল কি করে? সব সময় তো তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি। কয়েকদিন আগেও তাকে যা-তা বলে অপমান করলাম। তবু কি সে আমাকে ভালবাসে, না তার ভালবাসার পাত্রী অন্য কেউ?

বহ্নির মন বলল, অন্য কোনো মেয়েকে সে ভালবাসে না। তুমিই তার ভালবাসার পাত্রী। অনেক বছর তো তার সঙ্গে পড়াশোনা করেছ। রেবেকা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে তাকে কি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেছ? দেখনি। সেই রেবেকাকেই যখন ফিরিয়ে দিল তখন তোমার বোঝা উচিত ছিল, সে তোমাকে ভালবাসে। আর তুমিও কি অস্বীকার করতে পারবে, তুমিও তাকে ভালবাস না? মজলিসে অত লোকজনের সামনে যে কথা বলল, তাতেও কি তুমি বুঝতে পারছ না, কে তার ভালবাসার পাত্রী?

হঠাৎ বহ্নির মনে হল, যদি সত্যি সত্যি তার ভালবাসার পাত্রী অন্য কোনো মেয়ে হয়? কথাটা মনে হতেই বহ্নির বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করল। সে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঐসব চিন্তা করছিল।

এমন সময় নিয়াজ মাতব্বর বাইরে থেকে এসে পাশের চেয়ারে বসে বললেন, কি ব্যাপার পত্রিকা না পড়ে শুধু পাতা উল্টাচ্ছ? মনে হচ্ছে কারো চিন্তা করছ?

বহ্নি হেসে উঠে বলল, কার কথা আবার চিন্তা করব? এমনি পাতা উল্টাচ্ছি।

দাদু বললেন, মানিকের মতো ছেলে থাকতে চিন্তা করার অভাব ঘটল নাকি?

বহ্নি মেকী রাগ দেখিয়ে বলল, মানিকের কথা অন্য মেয়ে ভাবতে পারে, আমি তার কথা ভাবতে যাব কোন দুঃখে?

আমার তো মনে হয়, অন্য মেয়েদের চেয়ে তুমিই তাকে নিয়ে বেশি ভাব।

দাদু, আপনি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন? মানিক কে, যে তার কথা ভাবতে যাব?

সে-কথা আমি আর কি বলব? মানিকই তো গতকাল সকলের সামনে তার ভালবাসার পাত্রীর কথা বলল।

তা বলেছে, কিন্তু আমি যে তার ভালবাসার পাত্রী তা তো বলেনি।

না বললেও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি।

আপনি ভুল বুঝেছেন।

যদি প্রমাণ দিতে পারি?

কই, দিন তো দেখি?

ঠিক আছে, সময় মতো দেব।

তাই দেবেন বলে বহ্নি উঠে নিজের রুমে চলে গেল।

চার-পাঁচদিন পরের ঘটনা। নিয়াজ মাতব্বর সদরে বসে নাতনির সাথে গল্প করছেন। এমন সময় মানিক এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

নিয়াজ মাতব্বর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা রেজিষ্ট্রি করার ব্যাপারে দেরি করছ কেন?

মানিক বলল, সেই জন্যে আপনার কাছে এলাম। আমি দু'একদিনের মধ্যে ঢাকা যাব। ফিরে এসে রেজিষ্ট্রির কাজটা সেরে নেব। তারপর সদরের পাশে গাড়ি দেখে বলল, আপনার ছেলে এসেছেন নাকি?

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, না। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে বহ্নিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ও তো কাল যাচ্ছে। তুমি ইচ্ছা করলে একসঙ্গে যেতে পার।

বহ্নি প্রথম থেকে মানিকের দিকে তাকিয়ে ছিল। দাদুর কথা শুনে মানিক বহ্নির দিকে তাকাতেই চোখে চোখে পড়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি বাসে বা ট্রেনে যাব।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, তা কেন? বহ্নির সাথেই যাও। ও তো একাই যাচ্ছে। তারপর বহ্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন?

বহ্নি বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই। কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেল।

মানিক দাদুকে বলল, কাল যেতে পারব কিনা ঠিক নেই। পরশুও যেতে পারি।

তুমি যদি পরশু সিওর হও, তা হলে বহ্নিও না হয় পরশুই যাবে।

না, তার দারকার নেই। উনি কাল যেতে চাচ্ছেন যান। আমি আমার সময় মতো যাব। এবার উঠবার অনুমতি দিন। দবির মিয়ার কাছে একটু যাব।

আর একটু বস; চা খেয়ে যাবে। তা দবির মিয়ার কাছে যাবে কেন?

মেদ্ধান দীঘিটা কেনার চেষ্টা করছি। ওখানে মাছ ও হাঁসের চাষ করব।

বেশ ভালো কথা ওটাতে বড় মাছের চাষ খুব ভালো হবে।

একটু পরে একটা কাজের মেয়ে দু'কাপ চা ও সেই সাথে কিছু হালকা নাশতা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে নিয়াজ মাতব্বর বললেন, আমি তোমার সম্বন্ধে দু'রকম কথা শুনেছি, কোনটা ঠিক বলবে?

মানিক বলল, কি শুনেছেন বলুন।

রহিম মেম্বার যে দিন জমি কেনার ব্যাপারে এসেছিল সেদিন কার নামে দলিল হবে জিজ্ঞেস করতে বলল, ঢাকার আজরাফ নামে একটা ছেলের নামে। তার ডাকনাম পান্থ। ছেলেটা নাকি খুব বড় ধনীর একমাত্র সন্তান এবং উচ্চশিক্ষিত। আরো বলল, পান্থই এখানকার সব প্রকল্পের প্ল্যান-প্রোগ্রাম দিয়ে টাকা ইনভেস্ট করছে। তুমি বোধ হয় ঢাকাতে তার কাছে থেকে টাকা আনতে যাচ্ছ?

জি, ঠিক বলেছেন।

তুমি তা হলে পান্থকে ভালোভাবে চেন?

জি, চিনি।

তার কথা শোনার পর আমি বহ্নিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে পান্থ নামে কাউকে জানে কিনা। বহ্নি বলল, পান্থ নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে সে কলেজ থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত পড়েছে। তুমি যে পান্থর কথা বলছ, সে বহ্নির ক্লাসমেট নয় তো? আচ্ছা, তোমাদের পান্থ কি একবারও এখানে আসেন না?

নিয়াজ মাতব্বরের কথা শুনে মানিক কি বলবে না বলবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইল।

কি হল কিছু বলছ না কেন?

মানিক অনেক আগেই নিয়াজ মাতব্বরকে খুব বিচক্ষণ লোক বলে জেনেছে। এখন তার কথা শুনে চিন্তা করল, বহ্নি নিশ্চয় আমাকে নিয়ে দাদুর সঙ্গে আলোচনা করেছে। এরপর ওঁর কাছে আত্মগোপন করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আত্মগোপন করে থাকতে হলে মিথ্যা কথা বলতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, দেখুন, আপনি মুরুব্বি ও গণ্যমান্য মানুষ। আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন করব না। তবে একটা অনুরোধ করব, সেটা আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। আপনার কথার জবাবে যা বলব, তা কাউকে জানাবেন না। এমন কি আপনার নাতনিকেও না।

নিয়াজ মাতব্বর যা বুঝার বুঝে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বল, কি বলতে চাও?

মানিক বলল, আপনি যা অনুমান করেছেন তা সত্য। আমিই পান্থ।

নিয়াজ মাতব্বর মানিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, আমি প্রথম দিন তোমাকে দেখে তোমার পরিচয় বিশ্বাস করিনি। তারপর তোমার কথাবার্তা শুনে এবং তোমার কার্যকলাপ দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। যাকগে, তোমাকে দুটো প্রশ্ন করছি। প্রথমটা হল, তুমি জান বহ্নি তোমাকে চিনে ফেলেছে। তবু তার কাছে তা স্বীকার করনি কেন? দ্বিতীয়টা হল, লতিফার বিয়ের দিন বলেছিলে, একটা মেয়েকে তুমি অনেক দিন থেকে ভালবাস; সেও তোমাকে ভালভাসে। সেই মেয়েটার পরিচয় জানতে চাই।

মানিক অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুব কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছেন। উত্তর দিতে আমি অক্ষম। সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

নিয়াজ মাতব্বরের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুঠে উঠে মিলিয়ে গেল। বললেন, ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা অবশ্য সবার কাছে বলা যায় না। তবে আমার কাছে বললে তোমার কোনো ক্ষতি হত না। যাই হোক, না বলাতেও তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। ক্ষমা

চাইছ কেন? আমার যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। এবার তুমি যাও, কোথায় যেন যাবে বলছিলে?

মানিক সালাম বিনিময় করে সেখান থেকে আসার সময় চিন্তা করল, বহ্নিই যে আমার ভালবাসার পাত্রী তা নিশ্চয় নিয়াজ মাতব্বর বুঝতে পেরেছেন।

এবার মানিক অর্থাৎ পান্থ ঢাকায় এসে ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে ম্যানেজার তাকে বললেন, আপনার বাবা আবার ফোন করেছিলেন, আপনাকে বাসায় যেতে বলেছেন।

পান্থ বাসায় এসে প্রথমে মাকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করল। তারপর জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ তো মা, তোমার নালায়েক পান্থকে চিনতে পার কিনা?

আফসানা বেগম প্রথমে ছেলের দাড়ি দেখে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাকে সালাম দিয়ে ও কদমবুসি করতে দেখে খুব অবাক হয়েছেন। তার কথা শুনে মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, ছেলের যতই পরিবর্তন হোক, মা ঠিক ছেলেকে চিনতে পারবে।

পান্থ বলল, তুমি ও আব্বা কেমন আছ?

আফসানা বেগম চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, তুই আর ভালো থাকতে দিলি কোথায়? ঢাকায় টাকা তুলতে আসিস অথচ বাসায় আসিস না। তখন মা-বাবার কথা মনে পড়েনি?

এমন সময় শরীফ সাহেব বাসায় এসে ছেলেকে দেখে যেমন অবাক হলেন তেমনি আনন্দে বুকটা ভরে গেল।

পান্থ মাকে ছেড়ে দিয়ে বাবাকেও সালাম দিয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন আব্বা?

শরীফ সাহেব ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে ভিজে গলায় বললেন, ভালো আছি, তুমি বেশ কিছু অন্যায় করেছ। তোমার কাছ থেকে তা আমরা আশা করিনি। প্রথমত, তুমি না বলে চলে গেছ। দ্বিতীয়ত, চিঠি দিলেও থাকার ঠিকানা দাওনি। তৃতীয়ত, এর মধ্যে কয়েকবার ঢাকায় এসেছ অথচ বাসায় এসে আমাদেরকে দেখা দিয়ে যাওনি। কথা বলতে বলতে ওনার গলা ধরে এল।

পান্থ বসে পড়ে বাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার অন্যায় হয়েছে আমাকে মাফ করে দিন।

শরীফ সাহেব ছেলেকে তুলে একটা সোফায় বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর আবার বললেন, যেখানে আছ এবং যা কিছু করছ তা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে করা তোমার উচিত ছিল।

আফসানা বেগম স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এখন ওসব কথা থাক। তোমরা কাপড় পাল্টে হাত মুখ-ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া কর। পরে এক সময় যা বলার বলো।

বিকেলে চায়ের টেবিলে শরীফ সাহেব পান্থকে বললেন, ব্যাংকের ম্যানেজার ফোনে জানালেন, আজও তুমি পাঁচ লাখ টাকা তুলেছ। তোমার টাকা তুমি খরচ করবে তাতে বাধা দেব না। তোমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছি। টাকাগুলো যে বাজে খরচ করছ না, সে বিশ্বাস আমার আছে। তবু মা বাবা হিসাবে জিজ্ঞেস করার অধিকার আমাদের আছে।

পান্থ বলল, তা থাকবে না কেন? আপনি জিজ্ঞেস না করলেও এবারে সবকিছু বলতাম। আমি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতির জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। তারপর কোথায় কিভাবে কি কি প্রকল্প করেছে এবং করবে তা সব বলল।

শরীফ সাহেব শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু ঐসব এখানেও করতে পারতে?

এমন সময় আসরের আযান শুনে পান্থ বলল, নামায পড়ে এসে আপনার কথার উত্তর দেব। তারপর সে নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেল।

শরীফ সাহেব স্ত্রীকে বললেন, লক্ষ্য করেছ, পান্থর কত পরিবর্তন হয়েছে? তোমাকে একদিন বলেছিলাম না, পান্থ গিয়ে ভালোই করেছে। এবার নিজেকে ও সাধারণ মানুষকে জেনে স্বাবলম্বী হতে পারবে। দেখলে তো আমার কথাই ফলল। মনে হয় কোনো আলেম লোকের সাহচর্য পেয়েছে। যাক, আল্লাহ মস্তবড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিলেন।

আফসানা বেগম বললেন, পান্থ বেশ রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রঙও কালো হয়ে গেছে।

শরীফ সাহেব বললেন, শহরের লোক গ্রামে গেলে ওরকম একটু হয়।

পান্থ নামায পড়ে ফিরে এলে শরীফ সাহেব তাকে বললেন, এবার বল কি বলতে চাচ্ছিলে।

পান্থ বলল, আপনি তখন বললেন, এইসব প্রকল্প এখানেও করা যেত। তা হয়তো যেত। কিন্তু শহরের লোকজন তবু কিছু না কিছু কাজ করে খেতে-পরতে পাচ্ছে। অপর দিকে গ্রামের লোক কি যে মানবেতর জীবন যাপন করছে, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। চাষের সময় ছাড়া দরিদ্র মানুষগুলো বছরের বেশির ভাগ সময় অর্ধাহারে-অনাহারে কাটায়। আমি তাদের জন্য গ্রামে এসব করছি। সেই সঙ্গে তাদের কর্মসংস্থান ও তাদের মধ্যে যতটুকু সম্ভব শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করছি। গ্রামে কলেরা, বসন্ত ও ডায়রিয়ায় কিভাবে পাইকারী হারে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত মারা যায়, তা যদি আপনারা দেখতেন, তা হলে বুঝতে পারতেন আমার কথা কতটা সত্য। আমরা যারা ধনী ও শিক্ষিত তারা বাড়ির উপর বাড়ি, গাড়ির উপর গাড়ি এবং কিভাবে আরও ধনী হওয়া যায় তার চেষ্টা করে চলেছি। দেশের আপামর দরিদ্র জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা কখনও চিন্তা করি না। আর করার সময়ই বা কোথায় আমাদের। আমরা তো নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকি। অথচ কুরআন-হাদিসে বেশি লোভ-লালসা ও ভোগভিলাসে মত্ত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে আল্লাহ

পাক বলিয়াছেন, "খুব খাও ও পান কর, আর সীমা লংঘন করিও না।"[১] কুরআন মজিদে আরো বলিয়াছেন, "নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"[২] আমার মনে হয় অপব্যায়ের টাকায় সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য উৎপাদনমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান করে দেয়া ধনীদের উচিত। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরা লেখাপড়া করে শহরে অর্থ উপার্জন করতে এসে শহরের চাকচিক্যের প্রলোভনে পড়ে গ্রামকে ভুলে যায়। তারা শহরে সুখে দিন কাটায়। সেই সুযোগে গ্রামের প্রভাবশালী ও অর্থশালী লোকরা গরিবদের শোষণ করে চলে। নানারকম ফন্দিফিকির করে গরিবদের জমি-জায়গা হাতিয়ে নেয়। অবশ্য গ্রামে দু'একজন যে ভালো লোক নেই তা নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। গ্রামের শিক্ষিত ছেলেরা শহরে অর্থ উপার্জন করলেও যদি গ্রামের লোকের দিকে লক্ষ্য রাখত, তা হলে সেখানে অর্থশালী ও প্রভাবশালী লোকেরা গরিবদের শোষণ করতে পারত না। আপনারা আমাকে শুধু মডার্ন এডুকেশন দিয়ে মানুষ করেছেন; কিন্তু আসল শিক্ষা যা কুরআন-হাদিসে বিদ্যমান, তা দেননি। শুধু আপনারা কেন, শহরের ও গ্রামের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া প্রায় সব ধনীরা তাই করে থাকেন। অথচ কুরআন-হাদিসের জ্ঞান ছাড়া মানুষ অন্য যত কিছু জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বলা যায় না। কোনো অপূর্ণাঙ্গ জিনিস যেমন কোনো কাজে লাগে না তেমনি অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান কোনোদিন নিজের ও অন্য মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। সর্বযুগের বড় বড় জ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, "মানুষ পার্থিব জ্ঞান যতই অর্জন করুক না কেন, সেই সঙ্গে যদি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন না করে, তা হলে প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারবে না।" ওঁরা আরো বলেছেন, "বর্তমান যুগে মানুষ ধর্মকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু পার্থিব জ্ঞান অর্জন করে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে অশান্তিতে দিন যাপন করছে এবং মানুষের মধ্যে এত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এমন কি নিজের দেশেও নানারকম অরাজকতার সৃষ্টি করছে।" মনীষীদের অনেকে একথাও বলেছেন, "পৃথিবীর মানুষ যদি মর্ডান এডুকেশনের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে মেনে চলে, তা হলে তারা সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে মানুষ পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হবে।" মনীষীদের কথা যে কত সত্য তা শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীর মানুষের চরিত্রের যে অবক্ষয় ঘটেছে এবং তার গতি যে আরো দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। জানেন বাবা, আমি জানতাম ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। যার ইচ্ছা হয় ধর্ম-কর্ম করবে, না হয় করবে না। কিন্তু এটা যে কত বড় ভুল, তা আমি কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা ও ধর্মের বিভিন্ন বই না পড়লে বুঝতে পারতাম না। ধর্ম মানে শুধু দিনে পাঁচবার নামায পড়া, এক মাস রোযা রাখা, ধনীদের জীবনে একবার হজ্ব করা এবং বছরে একবার জাকাত দেয়া নয়। আর মানুষ একবার কলেমা পড়লেই মুসলমান হয়ে গেল, তার আর করণীয় কিছু নেই, এটাও ঠিক নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনেকে কলেমা পড়তে পারেন, তাই বলে তারাও কি মুসলমান

(১) সূরা-আ'রাফ, পারা-৮, ৩১নং আয়াতের শেষ অংশ।
(২) সূরা-বনি ইসরাঈল, পারা-১৫, ২৭নং আয়াতের প্রথম অংশ।

হয়ে গেল? না, তা হয় না। প্রকৃত মুসলমান হতে হলে মুখে কলেমা পড়ার সাথে সাথে তার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করে তা বিশ্বাস করতে হবে এবং ক্বুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে সেসব মেনে চলে চরিত্রবান হতে হবে। তবেই আমরা মুসলমান বলে দাবী করতে পারব। ইসলামের মূল শিক্ষা হল তিনটে। প্রথম, একত্ববাদ। অর্থাৎ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সবর্ত্র বিরাজমান। দ্বিতীয়, রিসালত। অর্থাৎ তিনি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র যুগে যুগে নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন এবং হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ রসুল। ওঁর পর কোনো নবী বা রসুল দুনিয়াতে আসবেন না। তৃতীয়, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং সেই শিক্ষার অনুশীলন করে নিজেকে চরিত্রবান করা এবং সেই শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকেও চরিত্রবান করার চেষ্টা করা। ক্বুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি। তখন আমার মনে হল, স্কুল থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত যত পড়াশোনা করলাম, একমাত্র ডিগ্রী ছাড়া তার এক পয়সাও মূল্য নেই। কারণ এত পড়াশোনা করেও নিজের ও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে পারিনি। আপনিই বলুন, যে নিজের ও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানল না, সে কি মানুষ? ক্বুরআনের জ্ঞান লক্ষ লক্ষ মহাসাগরের পানির চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে সেই জ্ঞানের একবিন্দু জ্ঞানও আমি অর্জন করতে না পারলেও তবু যেটুকু পেরেছি তা বলছি শুনুন, কলেমা হল গাছের মূল। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত হল গাছের গুঁড়ি। আর ধর্মের অন্যান্য সব আইন-কানুন হল কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা এবং পাতা। এগুলোর যে কোনো একটা না থাকলে যেমন গাছ বাঁচতে পারে না তেমনি ইসলামের সবকিছু না মেনে শুধু নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত আদায় করলেও প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। প্রকৃত মুসলমান একদিকে যেমন ঐসব করবে, অপরদিকে তেমনি জীবন যাপনের জন্য যা দরকার তা করবে এবং সেই সঙ্গে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবে। তারা নিজেদের আয়েশ-আরাম ও ভোগবিলাসের চেয়ে সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাকে অগ্রাধিকার দিবে। আমি আর বেশি কিছু বলতে পারব না। বেশি বলার জ্ঞান এখনও আমি অর্জন করতে পারিনি। শুধু আর একটা কথা বলব, আপনারা নিজের ও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানার জন্য ক্বুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ার সাথে সাথে কিছু কিছু ধর্মের অন্যান্য বই পড়বেন। তারপর বলল, আমাকে দু'একদিনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। টাকার জন্য কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে আছে।

শরীফ সাহেব ও আফসানা বেগম ছেলের কথা শুনতে শুনতে নিজেদের দোষ-ত্রুটি বুঝতে পারলেন। তার ধর্মীয় জ্ঞান ও গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য পরিকল্পনার কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

শরীফ সাহেব বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা এই সব খেয়াল না করে একদিকে যেমন ধর্মের কোনো কিছু জানি না, অপরদিকে তেমনি দেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে চিন্তাও করি না।

আফসানা বেগম বললেন, আল্লাহ তোকে হেদায়েত দিয়েছেন. তিনি যেন আমাদেরকেও হেদায়েত দেন। কতদিন পরে এলি। কয়েকদিন থাক, তারপর যাবি। আবার কবে আসবি-না-আসবি তার কোনো ঠিক আছে। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিবি। ঘন ঘন আসবি। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে যাই চল। কি করছে-না-করছে দেখে আসি।

শরীফ সাহেব বললেন, কিছুদিন পরে যাব। এখন খুব ব্যস্ত আছি।

আফসানা বেগম ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, বহ্নি নামে কোনো মেয়েকে চিনিস নাকি?

পান্থ বহ্নির নাম শুনে হোঁচট খেল। সামলে নিয়ে বলল, আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি।

গতকাল সে ফোন করে তোকে চাইল। তুই অনেকদিন বাড়িতে নেই শুনে কোথায় আছিস জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম কোথায় আছে জানি না। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খবরাখবর জানালেও ঠিকানা জানায় না। আমার কথা শুনে বহ্নি একটা ঠিকানা লিখতে বলল। তারপর আবার বলল, এই ঠিকানায় খোঁজ নিন। সেখানে নাম পাল্টে ছদ্মবেশে আছে। আজকালের মধ্যে ঢাকায় আসবে। আমি বহ্নিকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। ততক্ষণে সে ফোন রেখে দিয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে কি তোর যোগাযোগ আছে?

না নেই। তবে কিছুদিন আগে সে তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। যেখানে আমি আমার পরিকল্পনার কাজ করছি সেখানেই ওদের গ্রামের বাড়ি। বহ্নি যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা আমি জানতাম না। সে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আমাকে চিনতে পারে। নিজেকে আড়ালে রাখার জন্য মানিক নাম নিয়েছি। দু'চারজন ছাড়া কেউ আমার আসল পরিচয় জানে না।

তুই ওদের এখানকার ঠিকানা জানিস?

জানি।

এক সময় বহ্নিকে নিয়ে আসিস।

মা, কিছু মনে করো না; আমি তা পারব না।

কেন?

তাও বলতে পারব না। আমাকে ক্ষমা কর। এখন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। মাগরিবের নামায পড়ে ফিরব।

ঠিক আছে, যা।

পান্থ চলে যাওয়ার পর আফসানা বেগম স্বামীকে বললেন, কিছু বুঝতে পারলে?

শরীফ সাহেব বললেন, কি বুঝব?

আফসানা বেগম বললেন, ব্যবসার চিন্তায় অন্য ব্যাপার তোমার মাথায় ঢুকবে কেন? পান্থর কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বহ্নির সাথে ওর মনোমালিন্য হয়েছে। আমি বলছি শোন, বহ্নি যখন ফোন করেছিল তখন তার কথা ও গলার স্বর শুনে ওদের দু'জনের মধ্যে যে মনোমালিন্য হয়েছে তা একটু অনুমান করেছিলাম। এখন পান্থর কথা শুনে সেই অনুমানটা দৃঢ় হয়েছে। বহ্নির সঙ্গে কথা বলার সময় আমি তাদের ফোন নাম্বার নিয়ে লিখে রেখেছি। মেয়েটার গলার স্বর খুব মিষ্টি। আমার খুব ভালো গেলেছে। তুমি ওর বাবার সঙ্গে ফোনে আলাপ করে ওনার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে

আসতে বল। মেয়ে যদি দেখতে ভালো হয়, তা হলে তাকে বৌ করব। তারপর আফসানা বেগম উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা কাগজের টুকরো এনে স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা বহ্নিদের ফোন নাম্বার।

শরীফ সাহেব বললেন, তোমার কথা না হয় মানলাম; কিন্তু পান্থরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে?

আফসানা বেগম বললেন, তুমি পুরুষ। তার উপর ব্যবসার চিন্তা সব সময় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তুমি পান্থর পছন্দ-অপছন্দের কথা ভাবলেও আমি ভাবছি না। বহ্নির সাথে ফোনে যতটুকু কথা বলেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি, ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে। এখন পান্থর কথা শুনে বুঝতে পারলাম ওরা শুধু ভালবাসে না, খুব গভীরভাবে ভালবাসে।

শরীফ সাহেব মৃদু হেসে বললেন, আমাদের দু'জনের চেয়েও কি গভীর? স্বামীর কথা শুনে আফসানা বেগমের বিবাহপূর্ব ঘটনা মনে পড়ল। তখন সবে মাত্র বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। একদিন জনাদশেক বন্ধু-বান্ধবীকে নিয়ে একটা মাইক্রোবাসে করে জাফলং বেড়াতে গিয়েছিলেন। জাফলং-এ পর্যটকদের থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে সরকারী বাংলো আছে। তা শুধু সরকারী লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর যদি কেউ সরকারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আসে, তা হলে থাকতে পারে। সিলেটের হোটেলে এক রাত থেকে তারা পরের দিন সকালে জাফলং রওয়ানা দেন। সেখানকার পাহাড়ী পরিবেশ অতি মনোহর। সব থেকে আকর্ষনীয় হল জলপ্রপাত। সুউচ্চ পাহাড়ের মাথা থেকে ভীষণ বেগে পানি পড়ার দৃশ্য যে কত সুন্দর ও রোমাঞ্চকর তা যারা দেখেছে তারা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে না। ফেরার পথে কিছুদূর আসার পর আফসানা বেগমদের গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। ড্রাইভার দু'আড়াই ঘন্টা ধরে চেষ্টা করেও সারাতে পারল না। এদিকে সূর্য প্রায় অস্তমিত। চারদিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। কিভাবে রাত কাটাবে ভেবে সবাই ভয় পেল। এখানে হিংস্র প্রাণী না থাকলেও কিম্ভুতকিমাকার স্বল্প পোশাক পরিহিত জংলী মানুষগুলো তাদেরকে লক্ষ্য করছে দেখে ভয় পেতে লাগল। ওদের দলে দু'জন ছেলে বন্ধু ও ড্রাইভার আর বাকি সাতজন যুবতী মেয়ে। তারা ভয় পেয়ে ড্রাইভারকে বারবার তাগিদ দিতে লাগল। কিন্তু ড্রাইভার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হল না। শেষে একটা মেয়ে বলল, কি আর করা যাবে, দরজা-জানালা বন্ধ করে সবাইকে গাড়ির ভিতর রাত কাটাতে হবে । আফসানা বেগম খুব ভীত মেয়ে। এখানে রাত কাটাতে হবে শুনে কেঁদে ফেললেন। বললেন, তা হলে গাড়ির ভিতরেই মরে কাঠ হয়ে যাব।

এমন সময় তারা একটা প্রাইভেট কার বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখলেন। গাড়িটা এগিয়ে এলে সবাই হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল।

গাড়ির আরোহীরা দূর থেকে তাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। গাড়িতে শরীফ সাহেব ও তার মা-বাবা হালিমা বেগম ও গফুর সাহেব ছিলেন। তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি মাথার পর তাদের বিপদের কথা শুনে বললেন, আমরা বাংলোয় থাকব। বাংলো এখান থেকে মাইল খানেকের পথ। তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। ড্রাইভার আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে।

আমাদের সঙ্গে তোমরা রাতটা থেকে যাও। কাল সকালে যা হোক কিছু-একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

পরের দিন তাদের ও গফুর সাহেবের ড্রাইভার দু'জনে মিলে মাইক্রোবাস ঠিক করে ফেলল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে তারা চলে আসেন।

শরীফ সাহেব তখন ভার্সিটিতে পড়তেন। বাংলোতে সে রাতেই শরীফ সাহেবের সঙ্গে আফসানা বেগমের পরিচয় ঘটে এবং একে অপরকে পছন্দ করে। বিদায়ের আগে শরীফ সাহেব আফসানা বেগমের কাছ থেকে তাদের বাসার ঠিকানা জেনে নেন। তারপর ঢাকায় ফিরে একদিন আফসানা বেগমদের বাসায় যান।

আফসানা বেগম জাফলং থেকে ফিরে মা-বাবাকে বিপদের কথা এবং কিভাবে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সে কথা বলেছিলেন। শরীফ সাহেব বাসায় যেতে মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে দু'জনের অভিসার চলতে থাকে। ততদিনে আফসানা বেগম ভার্সিটিতে এম.এ.তে এ্যাডমিশন নিয়েছেন।

একদিন শরীফ সাহেব ভার্সিটি থেকে আফসানা বেগমকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, একে তোমাদের ছেলের বৌ হিসাবে পছন্দ হয় কিনা বল।

জাফলং-এর বাংলোতে হালিমা বেগমের আফসানা বেগমকে খুব ভালো লেগেছিল। সেই মেয়েকে নিয়ে এসে ছেলে যখন ঐ কথা বলল, তখন তিনি বললেন, এমন সুন্দর মেয়েকে কে না বৌ করতে চাইবে?

এর কিছুদিন পর গফুর সাহেব আফসানা বেগমকে ছেলের বৌ করে নিয়ে আসেন। বিয়ের পরে তাদের ভালবাসা আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। আজ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো দিন এতটুকু কথা কাটাকাটি হওয়া তো দূরের কথা অভিমান পর্যন্ত হয়নি।

আজ এই প্রৌঢ় বয়সে স্বামীকে সেই ভালবাসার প্রসঙ্গ তুলে ছেলের ও বহ্নির ভালবাসার তুলনা করে কথা বলতে শুনে আফসানা বেগম সেই সব ভাবছিলেন।

স্ত্রীকে এতক্ষন চুপকরে থাকতে দেখে শরীফ সাহেব হেসে উঠে বললেন, আমাদের ভালবাসার মতো আজকালের ছেলেমেয়েরা কি ভালবাসতে পারবে? এরা ভালবাসার অর্থই জানে না।

আফসানা বেগমও হেসে উঠে বললেন, তুমি অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। তবে সব জিনিসের ব্যতিক্রম আছে। অন্য ছেলেমেয়েদের কথা আমরা চিন্তা করব কেন? পান্থ ও বহ্নির কথা চিন্তা করব। বহ্নিকে আমি দেখিনি; কিন্তু ফোনে যতটুকু কথা বলেছে তাতেই আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বললাম। আমার অনুমান কতটা সত্য, তুমি খোঁজ নিলেই জানতে পারবে।

শরীফ সাহেব বললেন, তোমার অনুমান সত্য হলে আমি খুশি ছাড়া অখুশি হব না। পান্থ আমাদের একমাত্র সন্তান। আমরা যা কিছ করি না কেন, তার মতের বাইরে কিছু করা চলবে না।

আফসানা বেগম বললেন, তা তো বটেই।

পান্থ দু'দিন থেকে মা-বাবাকে শিগগির আবার আসার কথা দিয়ে দিনাজপুর চলে গেল।

আফসানা বেগম বারবার ছেলেকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিতে ও শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে দিলেন।

শরীফ সাহেব চেয়েছিলেন, পান্থ থাকতে থাকতে যেন বহ্নিকে নিয়ে তার মা-বাবা আসেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। স্ত্রীর কথায় সেদিন রাতেই বহ্নিদের বাসায় ফোন করতে বহ্নির মা ফোন ধরেন। বহ্নির বাবাকে দিতে বললে তিনি বললেন, উনি সিঙ্গাপুর গেছেন। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। শরীফ সাহেব বহ্নির বাবার অফিসের ফোন নাম্বার জেনে নিয়ে ফোনটা রেখে দিলেন। দিন পনের পরে শরীফ সাহেব অফিস থেকে বহ্নির বাবার অফিসে ফোন করলেন।

সেদিন বহ্নির বাবা আনোয়ার সাহেব অফিসে ছিলেন। ফোন ধরে বললেন, কে বলছেন?

শরীফ সাহেব বললেন, সে কথা পরে বলছি। আগে আমার ঠিকানা লিখে নিন। আপনি আমাদের বাসায় আসুন। পারিবারিক ব্যাপারে কিছু আলাপ করব। আর যদি আপনি আসতে দ্বিধাবোধ করেন, তা হলে আপনার ঠিকানা বলুন, আমরা না হয় আসব।

কিন্তু আপনি পরিচয়টা বলবেন তো?

এখন বলার ঠিক ইচ্ছা ছিল না। আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তখন বলতেই হচ্ছে। আমি শরীফ বলছি।

শরীফ তো কত লোকের নাম আছে। পরিচয় বলুন।

শরীফ ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক।

আনোয়ার সাহেব চমকে উঠে অবাক হয়ে ভাবলেন, হাতী হয়ে মশার সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলতে চাইছেন, খুব আশ্চর্যের কথা। তাড়াতাড়ি সালাম দিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করে ফেলেছি, মাফ করবেন।

শরীফ সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, মাফ চাওয়ার মতো বেয়াদবি করেননি। এখন আপনার ঠিকানা বলুন।

তার আর দরকার নেই। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।

এবার তা হলে রাখছি। তারপর সালাম বিনিময় করে রিসিভার রেখে দিলেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে আনোয়ার সাহেব শরীফ সাহেবের অফিসে এসে সালাম বিনিময় করে করমর্দন করলেন। ব্যবসায়ী হিসাবে উভয় উভয়কে চেনেন।

শরীফ সাহেব ওনাকে বসতে বলে বেয়ারাকে নাশতার অর্ডার দিলেন। তারপর বললেন, আপনি জানেন কিনা জানি না, পান্থ আমার একমাত্র সন্তান। সে কমার্সে মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছে। আপনার মেয়ে বহ্নিকে আমরা না দেখলেও তাকে আমরা চিনি। আমার স্ত্রী বহ্নিকে দেখতে চায়। আপনি একদিন বহ্নি ও তার মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুন। যদি আমার স্ত্রীর বহ্নিকে পছন্দ হয়, তা হলে ছেলের বৌ করার ইচ্ছা করেছে। পছন্দ অবশ্যই হবে। কারণ একদিন ফোনে তার সঙ্গে কথা বলে তাকে পছন্দ করে ফেলেছে।

আনোয়ার সাহেব খুব অবাক হলেও হাতে যেন চাঁদ পেলেন। আনন্দে কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা বলতে পারলেন না। সামলে নিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কতটুকু জানি তা বলব না। আপনার কথার উত্তরে শুধু বলব, এত সৌভাগ্য কি আমার মেয়ের হবে?

শরীফ সাহেব বললেন, কার ভাগ্যে কি আছে তা ভাগ্য যিনি গড়েছেন তিনিই জানেন।

আনোয়ার সাহেব বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বহ্নিকে আপনারা কি করে চিনলেন এবং বহ্নিই বা আপনাদেরকে জানল কি করে, তা ভেবে পাচ্ছি না।

শরীফ সাহেব বললেন, পান্থ আর বহ্নি অনেক বছর এক সাথে পড়াশোনা করেছে। তার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এখন বলুন, কবে আসছেন? তবে ভাববেন না, আমরা জোর করে কিছু করব। আপনাদের মতামতের দাম নিশ্চয় দেব।

আনোয়ার সাহেব বললেন, কি যে বলেন, বহ্নি আপনাদের ঘরে বৌ হয়ে যাবে এটা কল্পনা করতে পারছি না। কাল আমি একটু ব্যস্ত থাকব। পরশু বিকেলে আসব।

শরীফ সাহেব বললেন, কয়েকদিন আগে আপনার খোঁজ নিয়েছিলাম। আপনি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন। তখন থাকলে পান্থকে আপনারা দেখতে পেতেন। কয়েকদিন আগে দিনাজপুর চলে গেছে।

আনোয়ার সাহেব বললেন, আমরা আর দেখে কি করব? যার দেখা একান্ত দরকার সেই যখন এক সঙ্গে কয়েক বছর পড়াশোনা করেছে তখন আমাদের দেখা-না-দেখা সমান। এখন আসি তা হলে, পরশু দিন আসব। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেলেন।

সেদিন বাড়িতে এসে শরীফ সাহেব স্ত্রীকে বললেন, আজ বহ্নির বাবা আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পরশু বিকেলে স্বপরিবারে আসবেন।

আফসানা বেগম বললেন, মেয়ে পছন্দ হলে আমি কিন্তু গহনা পরিয়ে এনগেজমেন্ট করে ফেলব।

ছেলের মতামত নেবে না?

ও হ্যাঁ, তাই তো। তা হলে কি করা যায় বল তো?

শুধু একটা আংটি পরিয়ে দো'য়া করো।

তুমি ঠিক বলেছ; তাই করব। পান্থকে টেলিগ্রাম করে দাও; সে যেন দু'একদিনের জন্য হলেও তাড়াতাড়ি আসে। আমরা ওর মতামত নিয়ে শিগগিরই বিয়ের ব্যবস্থা করব।

আগে পান্থ আসুক, তারপর তার মতামত নিয়ে যা করার করা যাবে। তুমি পরশু দিন মেয়ে দেখ। তোমার পছন্দ হলে পান্থকে টেলিগ্রাম করব।

ঐ দিন আনোয়ার সাহেব ফিরে এসে স্ত্রীকে শরীফ সাহেবের কথা বললেন।

ওনার স্ত্রী তাসনিমা বেগম বললেন, বহ্নিরও মতামত থাকতে পারে। আমি তার মা। তাকে আমি যতটা জানি, তুমি বাবা হয়ে তা জান না। ও কিন্তু খুব বড়লোকের ছেলেকে পছন্দ করবে না। কারণ ও সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। বেশি বিলাসিতা পছন্দ করে না। গরিবদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। শরীফ সাহেব খুব বড়ো ধনী বলে শুনেছি, তার ছেলেকে পছন্দ করবে কিনা সন্দেহ।

আনোয়ার সাহেব বললেন, শরীফ সাহেব কথা দিয়েছেন, আমাদের মতামতের দাম দেবেন। তা ছাড়া বহ্নি পান্থকে চেনে। একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। আর বহ্নি যদি পান্থকে পছন্দ না করে, তা হলে তুমি মা হয়ে মেয়ের সুখের জন্য তাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পার। আমি শরীফ সাহেবকে যতটুকু জানি, তার মতো লোক আমাদের বহ্নিকে বৌ করতে চাচ্ছেন, সেটা আমাদের জন্যে যে কতবড় সৌভাগ্য তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। পান্থর মা বহ্নিকে দেখতে চেয়েছেন। তাতে মনে হয়, ওরা অনেকদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করলেও এবং তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় থাকলেও বহ্নি পান্থদের বাসায় কখনও যায়নি। তাই বলছি, বহ্নিকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ওখান থেকে ফিরে এসে বহ্নি কি করে দেখা যাক। তারপর যা করার করা যাবে।

তাসনিমা বেগম বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে আনোয়ার সাহেব স্ত্রী ও বহ্নিকে নিয়ে শরীফ সাহেবের বাসায় এলেন। শরীফ সাহেব ও আফসানা বেগম তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। তারপর আফসানা বেগম বহ্নিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বেশ সুন্দর মেয়ে তো! তুমি নিশ্চয় বহ্নি? আমার পাশে বস মা।

বহ্নি ওনার পাশে বসে বেশ অবাক হয়ে বলল, আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

তুমি সেদিন ফোন করে পান্থর কথা জিজ্ঞেস করতে আমি তোমার নাম জানতে চাইলে তুমিই তো বলেছিলে। পান্থ পরের দিন এসেছিল, দু'দিন থেকে চলে গেছে। আমি পান্থর মা।

বাবা-মা তাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছে বহ্নি বুঝতে পারল। এটা তা হলে পান্থদের বাড়ি। সে আর কিছু না বলে চুপ করে রইল।

আপ্যায়নের পর আফসানা বেগম একটা আংটি বহ্নির আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের মতামত জানালাম, আপনারা ভেবে-চিন্তে জানাবার পর যা কিছু করার করব। তবে মতামতটা একটু তাড়াতাড়ি জানাবার অনুরোধ করছি।

আনোয়ার সাহেব ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন, সে কথা আপনাদেরকে আর বলে দিতে হবে না।

বাসায় ফিরে আনোয়ার সাহেব স্ত্রীর সামনে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ওদেরকে তোর কেমন মনে হল? আমাদের তো বেশ ভালোই লাগল।

বাবা মা তাকে পান্থদের বাড়িতে তার বিয়ের ব্যাপারে নিয়ে গেছে জানার পর থেকে রেগে রয়েছে। বাবার কথা শুনে বলল, ওঁরা ভালো হলে কি হবে, ওঁদের ছেলে–এটুকু বলে চুপ করে গেল।

কি রে, চুপ করে গেলি কেন? ওঁদের ছেলে কি বলবি তো?

বহ্নি ভাবতে লাগল, পান্থ কি এবার বাড়িতে এসে আমাকে বিয়ে করবে বলে তার মা-বাবাকে বলেছে?

কী হল, কিছু বলছিস না কেন? তোরা তো একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিস?

তা করেছি।

তা হলে তো তুই পান্থর সব কিছু জানিস? আল্লাহ'র রহমতে ইভা ভালো ঘরে পড়েছে। তোকেও আমরা ভালো ঘরে দিতে চাই। শরীফ সাহেব আমাদের থেকে সব

দিক দিয়ে অনেক বড়। তাকে আমি অনেক দিন থেকে ভালোভাবে চিনি। ওনার মতো মানুষ হয় না। ওনার স্ত্রীকেও খুব ভালো বলে মনে হল।

কিন্তু বাবা তোমরা তো ওঁর ছেলেকে জান না।

জানি না বলেই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি। তুই তো তাকে জানিস।

ছোটবেলা থেকে বহ্নির স্বভাব হল, মনে যা থাকে, বাইরে ঠিক তার বিপরীত প্রকাশ করে। তাই স্বভাবগত কারণে সে পান্থকে প্রথম থেকে ভালবাসলেও বাইরে তা প্রকাশ করেনি। বরং তাকে সবার কাছে অভদ্র, অহঙ্কারী বলে। এমন কি পান্থকেও গ্রামের বাড়িতে ঐসব বলে অপমান করেছে। তার সঙ্গে মা-বাবা বিয়ে দিতে চাচ্ছে জেনে মনে মনে ভীষণ খুশি হলেও রেগে রয়েছে। বাবার কথার উত্তরে রাগের সঙ্গেই বলল, মা-বাবা ভালো হলে ছেলেও যে ভালো হবে, একথা ঠিক নয়।

তোর কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু জেনে রাখিস, ভাল মা-বাবার ঘরেই ভালো ছেলে মেয়ে হয়। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুই পান্থকে পছন্দ করিস না। কারণটা বলবি?

বহ্নি কি বলবে ভাবতে লাগল। পান্থকে সে ভালবাসে এবং তার কথা সব সময় ভাবে। কিন্তু তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে অথবা তাকে দেখলেই স্বভাবগত কারণে রেগে যায়। বহ্নির রেগে যাওয়ার আরো একটা কারণ আছে। অনেক দিন থেকে পান্থর উপর তার পাহাড়সম অভিমান জমে আছে। বহ্নি সিওর সে যেমন পান্থকে ভালবাসে, পান্থও তেমনি তাকে ভালবাসে। কিন্তু এতদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করেও কেন সেকথা সে জানাল না। তাই সে তার উপর রেগে রয়েছে। এখন বাবার কথার উত্তরে কিছু বলতে গেলে রাগে পান্থর সম্বন্ধে কি বলতে কি বলে ফেলবে ভেবে রাগটা সংযত করার জন্য চুপ করে রইল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আনোয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কি ভাসছিস, পান্থ কি ভালো ছেলে নয়? তার চারিত্রিক কোনো দোষের কথা তুই কি জানিস?

না বাবা, ওসব কিছু নয়।

তবে তুই খোলাখুলি কিছু বলছিস না কেন?

কলেজ ও ভার্সিটিতে একসাথে এতদিন পড়াশোনা করলাম। কিন্তু সে সব সময় আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। অথচ অন্য মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করে। খুব বড়লোকের ছেলে বলে অহঙ্কারী ভাব দেখায়।

বড়লোকের ছেলেমেয়েরা অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে। তোরও আছে। কেউ নিজের দোষ দেখতে পায় না। আমার মনে হয়, তুইও তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিসনি। বিয়ের আগে ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি সবারই থাকে। বিয়ের পর ওসব থাকে না। তুই যে বললি, তোর সঙ্গে পান্থ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, কি রকম করেছে বল তো শুনি।

বহ্নি বলল, সে সব আগের কথা না হয় বাদই দিলাম। রিসেন্টলি যা করেছে বলছি শোন, আমাদের গ্রামে যে সব প্রকল্প হচ্ছে তার আসল মালিক পান্থ। সে নাম পাল্টে মানিক নাম ধারণ করে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রহিম মেম্বার ও তার ছেলেকে হাত করে ঐসব করছে। এবার গ্রামে গিয়ে তাকে দেখেই আমি চিনে ফেলি এবং তাকে সে কথা জানাই। সে এতবড় অহঙ্কারী নিজেকে অস্বীকার করে বলল, "আপনি ভুল

করছেন। আমি পান্থ নই, মানিক। পান্থ নামে কাউকে চিনি না।" আমিও তাকে ছেড়ে দিইনি। অভদ্র, অহঙ্কারী, ছোটলোক বলে অপমান করে চলে এসেছি। তারপর আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমরা ফিরিয়ে দিও। কথা শেষ করে নিজের রুমে চলে গেল।

আনোয়ার সাহেব শরীফ সাহেবের মুখে পান্থ দিনাজপুর গেছে শুনেছিলেন। এখন মেয়ের মুখে পান্থই মানিক জেনে খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু মেয়ে আংটি খুলে ফেরত দিতে বলায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেশ রাগের সঙ্গে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখলে?

তাসনিমা বেগম বললেন, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? বহ্নি কি শুধু আমার মেয়ে, তোমার নয়?

কিন্তু শরীফ সাহেবকে কি বলব?

এখন কিছু বলার দরকার নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, কয়েকদিন পরে জানাব। আমি ওর মা। পেটে ধরেছি। লালন-পালন করে মানুষ করেছি। ওর স্বভাব আমি জানি। ছোটবেলায় যখন কোনো কিছুর জন্য জিদ ধরত তখন সেটা দিলে আরও রেগে যেত। জিদ থেমে গেলে সেটা আবার নিজেই নিত। বড় হয়েও সেই স্বভাব রয়ে গেছে। ওর কথাবার্তা শুনে আমার যতদূর মনে হয় ও পান্থকে শুধু পছন্দ করে না, ভালও বাসে। এখন আর ওকে কিছু বলা ঠিক হবে না। কিছুদিন যাক তখন আমি ওর মনের ইচ্ছা বুঝতে পারব।

আনোয়ার সাহেব বললেন, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে মেয়ে তো কোনোদিন সুখী হতে পারবে না। স্বামীর সঙ্গে সব সময় মনোমালিন্য থাকবে।

তাসনিমা বেগম বললেন, বিয়ের পর মেয়েদের স্বভাব অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে যায়। ওকথা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

আনোয়ার সাহেব বললেন, ঠিক আছে, কয়েকদিন পরেই না হয় শরীফ সাহেবকে যা জানাবার জানান যাবে। স্ত্রীর কাছে এ কথা বললেও মনে মনে ভেবে রাখলেন, যেমন করে হোক এই কাজ করতেই হবে।

কয়েকদিন পর তাসনিমা বেগম একদিন মেয়েকে বললেন, আমার ও তোর বাবার খুব ইচ্ছা পান্থকে জামাই করার। পান্থ যখন দু'একবার আমাদের বাসায় খেলতে এসেছিল তখন তাকে দেখেছি। বেশ সুন্দর ছেলে। তুই অপছন্দ করছিস কেন?

বহ্নি পান্থদের বাড়ি থেকে আসার পর, পান্থ গ্রামের বাড়িতে লতিফার বিয়ের সময় সকলের সামনে যে মেয়েটাকে ভালবাসার কথা বলেছিল, সেই কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিল, সে যদি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, তবে যতদিন পান্থ নিজের মুখে সে কথা আমাকে না বলবে ততদিন আমি কিছুতেই এই বিয়েতে মত দেব না। আর যদি তার ভালবাসার পাত্রী অন্য কেউ হয় এবং তাকে সে বিয়ে করে, তা হলে আমিও কোনো দিন বিয়ে করব না, চিরকুমারী থাকব। এখন মায়ের কথা শুনে রাগের সঙ্গে বলল, আমি কি বলেছি সে দেখতে খারাপ? কিন্তু অমন অভদ্র ও অহঙ্কারী ছেলেকে আমি পছন্দ করি না। সেদিন তো বললাম, বেশি বড়লোকের ছেলের সাথে আমার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না।

তাসনিমা বেগম আর কিছু বললেন না। এক সময় স্বামীকে মেয়ের কথা জানিয়ে বললেন, বহ্নি যখন পান্থকে পছন্দ করছে না তখন জোর করে কিছু করা কি ঠিক হবে?

আনোয়ার সাহেব বললেন, না, তা আমি করব না। আচ্ছা, ইভা বোধহয় পান্থকে চেনে। ওকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়?

তাসনিমা বেগম বললেন, তা জানাতে পার।

আনোয়ার সাহেব বললেন, ইভাকে আর একটা কথা বলতে হবে, বহ্নি অন্য কোনো ছেলেকে পছন্দ করে কিনা, সে যেন বহ্নিকে জিজ্ঞেস করে।

তাসনিমা বেগম বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমার সে কথা মনে হয়নি। জামাইকেও সব কিছু জানাতে হবে।

আনোয়ার সাহেব বললেন, ওদেরকে দু'চারদিনের জন্যে বেড়াতে আসার কথা ফোনে জানিয়ে দিই কি বল?

তাসনিমা বেগম বললেন, তাই দাও।

আনোয়ার সাহেব তখনই ফোন করে ইভাকে বললেন, তুই মারুফকে নিয়ে আজকালের মধ্যে দু'চারদিনের জন্যে আমাদের বাড়িতে আসবি। বহ্নির বিয়ের ব্যাপারে তোদের সাথে কথা বলব। এবার মারুফকে দে।

ইভা বলল, তোমাদের জামাই বাসায় নেই। এলে তাকে বলব।

আনোয়ার সাহেব বললেন, এখন রাখি তা হলে?

ইভা রাখ বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বাবার রিসিভার রাখার শব্দ পেয়ে সেও রেখে দিল।

দু'দিন পর বিকেলে ইভা ও মারুফ এল। সকালে ইভা সে কথা ফোন করে বাবাকে জানিয়েছিল, সে জন্যে আনোয়ার সাহেব অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছেন। আদর-আপ্যায়নের পর এক সময় আনোয়ার সাহেব মেয়ে ও জামাইকে বহ্নির বিয়ের কথা বলে শরীফ সাহেব ও তার স্ত্রীর মতামত বললেন।

মারুফ বলল, আমি শরীফ সাহেবকে চিনি। অত্যন্ত ভালো লোক, উনি আমাদের ব্যাংকের ক্লায়েন্ট। আর পান্থকেও চিনি। সেও খুব ভালো ছেলে।

ইভা বলল, হ্যাঁ বাবা পান্থ খুব ভালো ছেলে। তাকে আমিও চিনি। আমাদের বাসায় কয়েকবার খেলতে এসেছে। তা ছাড়া ওরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। একে অপরকে ভালোভাবে চিনে। আমার মনে হয় পান্থর সাথে বিয়ে হলে বহ্নি সুখী হবে।

স্বামী কিছু বলার আগে তাসনিমা বেগম বললেন, আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু বহ্নি রাজি হচ্ছে না।

ইভা বেশ অবাক হয়ে বলল, কেন?

পান্থ নাকি খুব অভদ্র আর অহঙ্কারী। ঐরকম ছেলেকে সে পছন্দ করে না।

ইভা কপাল কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে বলল, তাই না কি? ঠিক আছে, আমি বহ্নির সঙ্গে কথা বলে তোমাদেরকে জানাব।

ইভারা যে আসবে বহ্নি জানে না। তারা আসার আগে গাড়ি নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিল। সেখানে রুমা নামে এক বান্ধবীর সাথে দেখা হতে সে তাদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। তাই ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাসায় এসে আপা ও দুলাভাইকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, কি ব্যাপার, হঠাৎ কপোত-কপোতীর আগমন?

ইভা বলল, তুই বরাবর ঠোঁটকাটা রয়ে গেলি।

বহ্নি বলল, এ কথায় আবার ঠোঁটকাটা হয়ে গেলাম বুঝি? তারপর মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, দুলাভাই, কেমন আছেন বলুন? দেখে তো মনে হচ্ছে, দিনকাল বেশ ভালোই যাচ্ছে। ঘুষ খেয়ে খেয়ে সরি, উপরি ইনকাম করে দিন দিন ব্যাংকে টাকার পাহাড় জমাচ্ছেন নিশ্চয়?

মারুফ হাসতে হাসতে বলল, ব্যাংকে উপরি ইনকামের সুযোগ আছে, একথা তোমাকে কে বলল?

বহ্নি বলল, কে আবার বলবে? সেদিন আপা ফোন করে বলল, আপনি গাড়ি কিনেছেন। আজ গাড়ি দেখে মনে হল বেশ দামী। উপরি ইনকাম না থাকলে শুধু বেতনের টাকায় কি আর এসব করা যায়? তা ছাড়া এত নবাবী হালে...

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ইভা একটু রাগের সঙ্গে বলল, তুই থাম তো, না জেনে আজেবাজে কথা বলছিস।

বহ্নি বলল, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? যাকে বললাম সে তো হাসছে? ইভার বিয়ের পর থেকে বহ্নি তাকে তুমি করে বলে।

মারুফ হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলল, তুমি ওর কথায় কান দাও কেন? ওর জন্য আমি এমন একটা ছেলে চয়েস করেছি, যে নাকি বিয়ের আগেই উপরি ইনকাম করে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ি-গাড়ি করেছে।

বহ্নি বুঝতে পারল, দুলাভাই ইয়ার্কি করছে। বলল, আমি বিয়ে করলে তো তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

মারুফ বলল, বিয়ের আগে সবাই ওরকম বলে। বিয়ের পরে আর সে কথা কারো মনে থাকে না।

বহ্নি বলল, সবাই কি বলে আমার জানার দরকার নেই। আমারটা আমি বললাম।

ঠিক আছে, দেখা যাবে কতদিন বিয়ে না করে থাকতে পার।

তাই দেখবেন। ছেলেরা যেমন বিয়ে করার জন্য লালায়িত হয়, মেয়েরা সে রকম হয় না।

তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। তোমার আপা তো কয়েকবার বিয়ে করার জন্য তাগিদ দিয়েছিল। সে তো তোমার সামনেই রয়েছে, জিজ্ঞেস করে দেখ, সত্য না মিথ্যা।

আপার কথা বাদ দিন। আপার মতো তো সবাই নয়।

মারুফ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলে তোমার বোনের কথা?

ইভা বলল, আমি আমার বোনকে চিনি। এবার তুমি চেনো। ও যা বলে, করে ঠিক তার উল্টো।

মারুফ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তাই নাকি? তা হলে ও যে বলল, বিয়ে করবে না, ছেলেরা বিয়ের জন্য লালায়িত। তার অর্থ হল, তোমার বোন খুব শিগগিরই বিয়ে করতে চাচ্ছে এবং বিয়ের জন্য সে খুব লালায়িত হয়ে আছে?

বহ্নি খুব রেগে গিয়ে ইভাকে বলল, কথাটা বলে তুমি ভালো করলে না। তারপর দুলাভাইকে বলল, আপনি একটা রামবুদ্ধু ও স্ত্রৈণ। স্ত্রীর কথায় উঠেন আর বসেন। কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেল।

মারুফ হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বলল, তোমার বোন মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হয়নি।

ইভা বলল, ও বরাবরই ঐ রকম।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ইভা বহ্নির রুমে গিয়ে তাকে বলল, মা বলছিল তুই নাকি পান্থকে অপছন্দ করছিস?

বহ্নি বলল, শুনেছ যখন তখন আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

কিন্তু আমি তো জানি তুই তাকে ভালবাসিস।

আমার কথা তুমি জানলে কেমন করে?

আমি তোর বড় বোন। আমি জানব না তো কে জানবে?

তুমি ভুল জেনেছ। আমাকে কোনোদিন তার সাথে অভিসারে যেতে দেখেছ? অথবা কোনো দিন প্রেমালাপ করতে শুনেছ?

না, তা দেখিনি বা শুনিনি।

তা হলে ভালবাসার কথা বললে কেন?

কারো সাথে অভিসারে না গেলে বা প্রেমালাপ না করলেই যে ভালবাসা হয় না, এ কথা ঠিক নয়। ভালবাসা মনের ব্যাপার। অনেক ছেলেমেয়ে না দেখেও একে অন্যকে ভালবাসে। তুই পান্থর সঙ্গে অনেক বছর পড়াশোনা করেছিস, খেলাধুলাও করেছিস। তাকে তুই খুব ভালো করে চিনিস। তা ছাড়া ভাল না বাসলেও তার মতো ছেলেকে স্বামী হিসাবে পাওয়া যেকোন মেয়ের জন্য সৌভাগ্য। তুই তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না কেন?

সে যতই ভালো হোক, আর দুনিয়াশুদ্ধ মেয়ে তাকে পেয়ে সৌভাগ্যবতী হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাকে আমার পছন্দ নয়, এটাই আমার শেষ কথা। তুমি দুলাভাইয়ের সাথে ভালবাসা করে বিয়ে করেছ, তাই বলে আমাকেও সেরকম ভাবছ কেন? আমি ভালবাসা-টালবাসা বুঝি না।

ইভা বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, বেশ পান্থকে না হয় অপছন্দ। তার কথা বাদ দিলাম। তোর দুলাভাইয়ের একটা ক্লায়েন্ট আছে। তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। দু'দিন আমাদের বাসায় এসেছে। ছেলেটা দেখতে যেমন হ্যাণ্ডসাম তেমনি উচ্চশিক্ষিত এবং ধনীও। ভালো মেয়ের খোঁজ করছে। তোর দুলাভাইয়ের খুব ইচ্ছা তাকে ভায়রাভাই করার।

বহ্নি বলল, দুলাভাইয়ের ইচ্ছা হলে তো আর হল না; শালী মত দিলে তবে তো ভায়রাভাই করবে।

তুই মতই বা দিবি না কেন?

আমি বিয়ে করব না।

কেন?

আমার ইচ্ছা।

তোর ইচ্ছা গার্জেনরা মানবে কেন?

না মানলে না মানবে। আমার সাফ কথা, আমি বিয়ে করব না।

আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দিবি তো?

করেই দেখ না!

পান্থ যদি এসে তোকে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তাকে কি তুই ফিরিয়ে দিবি?

যখন এসে বলবে তখন চিন্তা করে উত্তর দেব।

এখন চিন্তা করে বল না কি উত্তর দিবি।

এখন সে কথা চিন্তা করা যাবে না। তুমি আর বকবক না করে দুলাভাইয়ের কাছে যাও। বেচারা তোমার অপেক্ষায় চাঁদের দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ইভা বহ্নির মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, বড় বোনের সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস? তারপর সে চলে গেল।

মারুফ জানে ইভা বিয়ের কথা বলতে বহ্নির কাছে গেছে। ফিরে এলে বলল, রেজাল্ট কি বল?

ইভা বলল, ওর স্বভাব তো আমার অজানা নয়। শুনে প্রথমে চটাং চটাং কথা শুনিয়ে দিল। অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা বলতে বলল, সে বিয়ে করবে না। শেষে যখন বললাম, পান্থ যদি এসে তোর কাছে প্রেম নিবেদন করে বিয়ে করতে চায়, তা হলে তাকে কি বলবি? বলল, যখন এসে বলবে তখন ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে।

মারুফ বলল, আমর বিশ্বাস পান্থ বহ্নিকে ভালবাসে। বহ্নিও পান্থকে ভালবাসে। কিন্তু পান্থ ওকে ভালবাসার কথা জানায়নি বলে তার উপর রেগে আছে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত।

আমি কিন্তু একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছি না, পান্থ এতদিন বহ্নির সঙ্গে পড়াশোনা করল; তাকে ভালও বাসল অথচ সে কথা বহ্নিকে জানাল না কেন?

আমি পান্থকে দু'তিন দিন দেখলেও একদিন মাত্র তার সাথে আলাপ হয়েছিল। সেই সময় তার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, সে খবু চাপা। আর এটাও বুঝেছি, পান্থ চায় বহ্নি প্রথমে তাকে ভালবাসার কথা জানাক; তারপর সে জানাবে।

তুমি ঠিক বলেছ। এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তা করে বলল, এক কাজ করা যাক, আমরা সবাই যখন পান্থর সঙ্গে বহ্নির বিয়ে দিতে চাই তখন কৌশলে এই কাজ করতে হবে। কৌশলটা পান্থর মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। তার আগে আমাদেরকে পান্থর মনের খবর জেনে সিওর হতে হবে।

ইভা বলল, তুমি দারুণ কথা বলেছ। আমি বাবার কাছে পান্থর সবকিছু জেনে নিয়ে তোমাকে জানাব। এবার এসব কথা থাক। রাত হয়েছে ঘুমাতে হবে।

মারুফ বলল, অনেকদিন পর শ্বশুরবাড়ি এলাম। নিরামীষ রেখে ঘুমাতে বলছ।

ইভা হেসে উঠে বলল, শ্বশুরবাড়ির আমিষ বুঝি খুব মজা?

সে কথা পুরুষরাই শুধু জানে; মেয়েরা জানে না, বলে মারুফ স্ত্রীকে আলিঙ্গনা-বদ্ধ করল।

পরের দিন সকালে নাশতা খাওয়ার পর ইভা স্বামীকে বলল, তুমি অফিসের পরে এসে আমাকে নিয়ে যেও। এর মধ্যে আমি বাবার সাথে কথা বলে যা জানার জেনে নেব।

মারুফ চলে যাওয়ার পর ইভা বাবাকে স্বামীর উদ্দেশ্যের কথা বলে পান্থর সব খবর জানতে চাইল।

আনোয়ার সাহেব পান্থ এখন কোথায় এবং কি করছে সব বললেন।

ইভা বলল, তাই নাকি? সে তা হলে এখন আমাদের গ্রামে প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত?

আনোয়ার সাহেব বললেন, হ্যাঁ রে মা তাই। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তারপর তাদের জমি ও পুকুর বিক্রির কথা বললেন।

ইভা বলল, ঠিক আছে, যা করার আমি ও তোমাদের জামাই করব। তোমরা কোন চিন্তা করো না। সেদিন বিকেলে ইভা অফিস-ফেরতা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

মারুফ এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ইভাকে সঙ্গে করে দিনাজপুরের ফুলবনে শ্বশুরদের গ্রামের বাড়িতে এল।

নিয়াজ মাতব্বর সদরে ছিলেন। তাদেরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বললেন, কোন দিকের চাঁদ কোন দিকে উঠল?

ইভা বলল, চাঁদ তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে সময় মতো উদিত হয়। কয়েকদিনের জন্য আমরা গ্রাম্য জীবন উপভোগ করতে এলাম।

নিয়াজ মাতব্বর বললেন, শুনে আনন্দিত হলাম। যাও ভিতরে গিয়ে দাদির সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিশ্রাম নাও। তারপর একজন চাকরকে ডেকে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে বললেন।

সন্ধ্যার পর ইভা দাদুকে বহ্নির বিয়ের ব্যাপারে সব কথা বলল।

দাদু বললেন, এবারে বহ্নি তো বেশ কিছুদিন এখানে ছিল। আমিও তাকে স্টাডি করে দেখেছি, সে পান্থকে ভালবাসে। যদিও পান্থর কথা বললেই চোটপাট দেখায়। বহ্নি চলে যাওয়ার পর পান্থর কাছে একদিন তার আসল পরিচয় জানতে চাইলে পান্থ স্বীকার করল, সে মানিক নাম নিয়ে এখানে কয়েকটা প্রকল্পে হাত দিয়েছে। তারপর লতিফার বিয়ের সময় যে কথা বলেছিল তা বলে বললেন, আমি তাকে তার ভালবাসার পাত্রীর পরিচয়ও জানতে চেয়েছিলাম। সে পরিচয় জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে মাফ চাইল। আমার ধারণা খুব সম্ভব বহ্নিই তার ভালবাসার পাত্রী। আমার আরো ধারণা, ওদের মধ্যে বরাবর ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছে।

ইভা বলল, আমার ও আপনার নাত জামাইয়েরও একই ধারণা। কিন্তু পান্থকে বিয়ে করতে বহ্নি কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। সে পান্থকে অভদ্র ও অহঙ্কারী ভাবে।

দাদু বললেন, আমি ওর মন বোঝার জন্য পান্থর কথা তুলে ইয়ার্কি করলে আমাকেও ঐ একই কথা বলেছিল।

মারুফ বলল, আমরা পান্থর মনের ভাব বোঝার জন্য এসেছি। পজেটিভ হলে সবাই মিলে পরামর্শ করে ওদের বিয়ে দেব। আর যদি নেগেটিভ হয় তা হলে বিয়ে অন্যত্র দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দাদু বললেন, তা ছাড়া আর উপায় কি?

একদিন ইভা ও মারুফ পান্থর অফিসে গেল। ইভা তার দাড়ি দেখেও চিনতে পারল। কিন্তু মারুফ পারল না।

পান্থ মারুফকে চিনতে না পারলেও ইভাকে চিনতে পারল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়ে সালাম দিয়ে বলল, ইভা আপা আপনি!

ইভা বলল, হ্যাঁ, কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এলাম। তারপর মারুফকে দেখিয়ে বলল, এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছ?

মারুফ এতক্ষণে পান্থকে চিনতে পেরে মিটিমিটি হাসছিল।

পান্থ কয়েক সেকেণ্ড মারুফের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, অনেক দিন আগে একবার মাত্র আপনাদের বাসায় দেখেছিলাম। তাই প্রথমে চিনতে না পারলেও এখন পারছি। নিশ্চয় দুলাভাই?

মারুফ এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করল।

পান্থ বলল, আপনারা বসুন। ওরা বসার পর মন্টুকে চা করে খাওয়াতে বলল। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কেমন আছেন বলুন?

ইভা বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, আমরা ভালো আছি, কিন্তু বহ্নির অবস্থা খুব খারাপ।

পান্থ চমকে উঠে আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেন, তার কি হয়েছে?

ইভা গলার স্বর করুণ করে বলল, সে বোধ হয় বাঁচবে না। কি যে হয়েছে ডাক্তারা কিছু বলতে পারছে না। কি যেন সব সময় চিন্তা করে। দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা করিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না।

বহ্নির অসুখের কথা শুনে পান্থর মুখটা খুব মলিন হয়ে গেল। বলল, বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন?

ইভা বলল, এখানকার ডাক্তাররা বলেছেন, এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা বিয়ে। বিয়ে ছাড়া এই রোগের কোনো বিকল্প চিকিৎসা নেই।

পান্থ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

ইভা বলল, বহ্নি কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, চিরকুমারী থাকবে।

এমন সময় মন্টু চা-নাশতা নিয়ে এসে পরিবেশন করল।

পান্থ বলল, নিন, শুরু করুন।

চা-নাশতা খেয়ে ফেরার সময় ইভা পান্থকে বলল, তুমি সময় করে আমাদের বাড়িতে এস, কেমন?

পান্থ বলল, আসব।

ফেরার পথে মারুফ স্ত্রীকে বলল, তোমার বুদ্ধি ও অভিনয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লক্ষ্য করেছ, বহ্নির অসুখের কথা শুনে পান্থর মুখের অবস্থা কি রকম করুণ হয়েছিল? বেচারাকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছ।

ইভা বলল, এছাড়া পান্থর মনের খবর পেতাম কি করে? যা জানার তা জানা হয়ে গেল। বাড়িতে এলে সত্য কথা বলে দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়া যাবে।

বাড়িতে পৌঁছতে দাদু বললেন, নায়কের মনের খবর জানতে পারলে?

ইভা বলল, পুরুষরা বলে মেয়েদের বুদ্ধি কম। কথাটা যে একদম মিথ্যে, তা আজ আমি প্রমাণ করে দিয়েছি। এক কথায় বাজিমাৎ। আপনার নাতজামাই বলুক, সে পারত কিনা।

দাদু বললেন, তোমার কথা না হয় মেনে নিলাম; এখন বাজিমাৎ করার ঘটনাটা বলে কৃতার্থ কর।

মারুফ স্ত্রীর কথা শুনে হাসছিল। হাসতে হাসতেই বলল, আপনার নাতনি বাজিমাৎ করেছে ঠিক কথা, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে।

ইভা একটু তেতে গিয়ে বলল, তাতে কি হয়েছে? যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এবং কোনো সমস্যার সমাধান করার জন্য কত রথী মহারথীরা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, ইতিহাসের পাতা খুললে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দাদু ইভাকে বলল, তোমাকে আমি সাপোর্ট করছি। এখন ঘটনাটা বল।

ইভা ঘটনাটা বলে বলল, পান্থকে এখানে আসতে বলেছি। এলে সবকিছু বুঝিয়ে বলা যাবে।

দাদু বললেন, দেখলে তো ভাই, আমার কথা ঠিক। কিন্তু তাতে করে সমস্যার সমাধান তো হচ্ছে না। বহ্নিকে রাজি করাবে কি করে?

ইভা বলল, আপনি প্রবীণ লোক। সমাধানের ভার আপনার উপর।

মারুফ ফোড়ন কাটল। বলল, দাদু তো পুরুষ। তুমি তো এক্ষুনি মেয়েদের বুদ্ধির বড়াই করছিলে। না দাদু, আপনি কিছু করবেন না, ইভাই করুক।

ইভা স্বামীর উপর আরও একটু তেতে গিয়ে বলল, তুমি শুধু কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটতে পার। বুদ্ধি তো ঘটে একটুও নেই। কি করে যে ব্যাংকের হিসাবপত্র কর ভেবে পাই না।

দাদু তাদের ঝগড়া শুনে বেশ মজা পাচ্ছেন। বললেন, আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভুলের সুযোগ নিয়ে মোটা অংকের টাকা ঘাপলা করে মেরে দিচ্ছে। তারপর ইভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি ভাই মাঝে মাঝে ব্যাংকে গিয়ে ওর হিসেবের খাতা চেক করে দিও।

দাদুর কথা শুনে মারুফকে হাসতে দেখে ইভা বলল, অত হেসো না। তোমার যা বুদ্ধি দাদুর কথামতো তোমাকে সাহায্য করাই আমার উচিত।

দাদু বললেন, এবার ঝগড়াঝাঁটি থাক। এখন চিন্তা কর, কি করে বহ্নির রোগ সারান যায়।

মারুফ বলল, পান্থকে তো আমরা আসার জন্য বলে এলাম, সে আসুক; বহ্নিকে বিয়ে করার জন্য আপনি প্রস্তাব দেবেন। সে কি বলে শোনার পর যা করার সবাই মিলে আলোচনা করে করা যাবে।

দাদু বললেন, কথাটা তুমি মন্দ বলনি। পান্থ রাজি হলে কাজটা সারতে সহজ হবে।

পরের দিন পান্থ নিয়াজ মাতব্বরের বাড়িতে এল।

সালাম বিনিময়ের পর নিয়াজ মাতব্বর বসতে বলে বললেন, তোমাদের প্রকল্পের অগ্রগতি কেমন চলছে?

পান্থ বসে বলল, আল্লাহ পাকের রহমতে ভালোই চলছে। আপনার বড় নাতনি নাতজামাই কাল আমাদের ফার্ম দেখতে গিয়েছিলেন। ওঁরা কি বাড়িতে নেই?

দাদু বললেন, আছে। তারপর একটা কাজের মেয়েকে চায়ের কথা বলে তাদেরকে ডেকে দিতে বললেন।

ইভা ও মারুফ এলে পান্থ সালাম জানাল।

তারা সালামের উত্তর দিয়ে দুটো চেয়ারে বসল। একটু পরে কাজের মেয়েটা চা-নাশতা দিয়ে গেলে ইভা পরিবেশন করল।

দাদু চায়ে চুমুক দিয়ে পান্থকে বলল, তুমি এসে খুব ভালো করেছ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই। না এলে ডেকে পাঠাতাম।

পান্থ বলল, বেশ তো, কি বলবেন বলুন।

দাদু বললেন, তোমার ও বহ্নির সম্পর্কের কথা। বহ্নি এখানে থাকার সময়ে তার মনের খবর কিছুটা অনুমান করেছিলাম। এখন ইভার কথা শুনে আমার অনুমান যে ঠিক, তা জানতে পারলাম। সে যাই হোক, আমি যদি বহ্নিকে বিয়ে করার জন্য তোমাকে প্রস্তাব দিই, তা হলে তুমি কি তোমার মতামত জানাবে?

পান্থ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করল। তারপর বলল, সে কথা পরে বলছি। কাল ইভা আপা বহ্নির কঠিন অসুখের কথা বললেন। আমার মনে হয়, তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালে সুস্থ হয়ে উঠবে।

দাদু বললেন, আমরাও তাই চাই। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন, বিদেশে নিয়ে গেলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে যদি বিয়ে দিয়ে স্বামীসহ পাঠান হয়, তা হলে কোনো চিন্তা থাকবে না।

পান্থ বলল, ইভা আপার মুখে শুনলাম, বহ্নি বিয়ে করতে চাচ্ছে না। আপনারা তাকে তার অসুখের কথা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান।

দাদু বললেন, সেই জন্যেই তো তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম।

পান্থ বলল, আমার ও বহ্নির ব্যাপারে আপনারা যা অনুমান করেছেন তা সত্য। তবে কেন কি জানি, বহ্নি আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না। আমাকে অভদ্র ও অহঙ্কারী ভাবে। বিয়ে করতে কি রাজি হবে?

দাদু বললেন, সে দায়িত্ব আমাদের। তুমি রাজি আছ কিনা বল?

পান্থ বলল, আমার কোনো অমত নেই। তবে মা-বাবার কাছে প্রস্তাব দেবেন।

দাদু বললেন, তা তো দেবই। তোমার মতামত জানার জন্য আমরা তোমার কাছে অনেক কিছু গোপন রেখেছিলাম। এখন সেসব তোমার জানা দরকার। তারপর ইভাকে বললেন, তুমি সবকিছু খুলে বল।

ইভা প্রথমে বলল, তুমি বহ্নিকে সত্যিই ভালবাস কিনা জানার জন্য গতকাল মিথ্যে করে বহ্নির অসুখের কথা বলেছি। তারপর পান্থর মা-বাবা কিভাবে বহ্নিকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সে কথা বলে বলল, প্রস্তাব শুনে আমরা সবাই রাজি; কিন্তু বহ্নি কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই।

ইভা থেমে যেতে দাদু বললেন, এবার আমি তোমাদেরকে সমস্যার সমাধান বাতলে দিচ্ছি। তারপর কে কি করবে তা বুঝিয়ে বলে সেরকম ব্যবস্থা করতে বললেন।

দাদুর কথা শুনে সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তাই দেখে দাদু হাসিমুখেই বললেন, এত বড় সমস্যার সমাধান করে দিলাম, পুরস্কারের কথাটা কেউ যেন ভুলে যেও না।

ইভা বলল, পান্থ ও বহ্নির বিয়েটা ভালোয় ভালোয় মিটে যাওয়াটাই তো আপনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

দাদু বললেন, হ্যাঁ ভাই তুমি খুব দামী কথা বলেছ। সেটাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এবার প্রমাণ হল, তুমি তোমার সাহেবের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তারপর মারুফের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কথায় তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। কারণ তুমি খুব ভাগ্যবান। ইভার মতো সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী পেয়েছ।

মারুফ হেসে উঠে বলল, বহ্নি ইভার চেয়ে বেশি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। কয়েকদিনের মধ্যে পান্থ তা হলে আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান হতে যাচ্ছে, কি বলেন?

দাদু বললেন, তুমি খুব খাঁটি কথা বললেও তোমার মতো পান্থরও বুদ্ধি কম। তা না হলে একটা মেয়েকে এত বছর ধরে ভালবাসতে পারল অথচ সে কথা তাকে জানাতেও পারল না এবং বিয়ে করতেও পারল না। আমরা বুদ্ধি খরচ করে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

এ কথায় সবাই হেসে উঠল।

ঐদিন ফেরার পথে পান্থ সালেকের সঙ্গে দেখা করে বহ্নিকে বিয়ে করার কথা বলল।

গতকাল ইভা ও মারুফ চলে আসার পর পান্থর মন খারাপ দেখে সালেক তার কারণ জিজ্ঞেস করে। পান্থ প্রথমে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়। বহ্নির অসুখের কথা শুনে সেই থেকে সালেকেরও মন খারাপ হয়েছিল। আজ সবকিছু শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলে পান্থকে জড়িয়ে ধরে বলল, আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই। আজকের মতো এত আনন্দ সারা জীবনেও পাইনি। আমার কিন্তু প্রথম থেকে তোমার ও বহ্নি আপার কথা শুনে ঐ রকম কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল। তারপর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বলল, দো'য়া করি, আল্লাহ যেন তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করান।

ইভা ও মারুফ পান্থ ও সালেককে নিয়ে একদিন ফিরিঙ্গী ঘাট, সাইতিরা দ্বীপ ও নীলকুঠী দেখে এল। আরও দু'তিন দিন সবাই মিলে ওখানকার বিভিন্ন গ্রামের সাগর দেখতে গেল। এই অঞ্চলের লোকেরা দীঘিকে সাগর বলে। আশপাশের গ্রামগুলোতে বেশ কয়েকটা সাগর রয়েছে। যেমন–রাম সাগর, আনন্দ সাগর, সুর সাগর, মাতা সাগর প্রভৃতি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। শীতের মৌসুমে এসব সাগরে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে কয়েক জাতের বড় বড় অতিথি পাখি এসে থাকে। এসব পাখিদের শিকার করা সরকারী নিষেধ সত্ত্বেও লোকেরা শিকার করে।

এক সপ্তাহ ওখানে থেকে ইভা ও মারুফ ঢাকা ফিরে এল। ইভা মা-বাবাকে দাদুর পরামর্শের কথা বলে তারা বনানী চলে গেল। তাদের এই সফরের কথা বহ্নিকে জানান হল না।

দশ-বার দিন পর নিয়াজ মাতব্বর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় ছেলের বাসায় এলেন। এক সময় ছেলে-বৌকে নিয়ে বহ্নির বিয়ের ব্যাপারে আরো ভালো করে আলোচনা করলেন।

আনোয়ার সাহেব একদিন শরীফ সাহেবকে ফোন করে বললেন, আপনারা আমার মেয়ের ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাতে আমরা রাজি আছি। আপনাদের ছেলেকে ডেকে পাঠান। সে এলে কথাবার্তা পাকা হবে। কারণ তারও তো মতামত জানা দরকার।

শরীফ সাহেব বললেন, তা তো বটেই। আমরা পান্থকে দু'চার দিনের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করছি।

ঐদিন সন্ধ্যায় পান্থ ঢাকায় এল ।

আফসানা বেগম ছেলেকে দেখে বললেন, তুই এসে খুব ভালো করেছিস। তোর বাবা তোকে আনার জন্য কালই লোক পাঠাত। আমরা তোর বিয়ে দেব বলে একটা মেয়ে পছন্দ করেছি। মেয়ের পক্ষে সবাই রাজি। কথাবার্তাও এক রকম পাকা হয়ে গেছে।

পান্থ বলল, কিন্তু মা আমাকে না জানিয়ে এসব করতে গেলে কেন? আমারও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে।

তা তো নিশ্চয়। তুই মেয়েকে চিনিস। আনোয়ার সাহেবের মেয়ে বহ্নি। তাকে তো তুই চিনিস।

হ্যাঁ চিনি। তবু আমাকে জিজ্ঞেস না করে পাকা কথা দেয়া ঠিক হয়নি।

কেন, তুই কি বহ্নিকে পছন্দ করিস না?

আমি শুধু পছন্দ করলে তো হবে না, বহ্নি যদি পছন্দ না করে?

সে কথা তোকে ভাবতে হবে না। আনোয়ার সাহেব কি তার মেয়ের মত না নিয়ে রাজি হয়েছেন?

ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো বুঝ কর। আমার কোনো অমত নেই।

পান্থ যখন বাড়িতে আসে তখন শরীফ সাহেব ছিলেন না। ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সবকিছু শুনে বললেন, পান্থ যে রাজি হবে তা জানতাম। কার ছেলে দেখতে হবে তো?

আফসানা বেগম হেসে উঠে বললেন, পান্থ বুঝি শুধু তোমার ছেলে? তুমি বুঝি পেটে ধরেছিলে?

শরীফ সাহেবও হেসে উঠে বললেন, সরি, ভুল হয়ে গেছে।

আফসানা বেগম বললেন, ওসব কথা বাদ দিয়ে আনোয়ার সাহেবকে ফোন করে ছেলের আগমন বার্তা জানিয়ে দাও।

এক্ষুনি করছি বলে শরীফ সাহেব ফোন করে আনোয়ার সাহেবকে জানিয়ে দিলেন।

পরের দিন আনোয়ার সাহেব বাবাকে ও স্ত্রীকে নিয়ে শরীফ সাহেবের বাড়িতে এসে তাদের সঙ্গে বহ্নি ও পান্থর বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। শুধু দিনটা পরে ঠিক করা হবে।

কয়েকদিন পরে নিয়াজ মাতব্বর একদিন বহ্নিকে ডেকে বললেন, দাদু, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কবে বলতে কবে ডাক আসে তার ঠিক নেই। তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে পাড়ি দিতে পারতাম।

বহ্নি বলল, হায়াৎ-মউতের কথা আল্লাহ পাক জানেন। আপনার চেয়ে কত বয়স্ক ও রুগ্ন লোক বেচেঁ আছে।

দাদু বললেন, তোমার কথা যেমন সত্য তেমনি কত কম বয়স্ক ও সুস্থ সবল লোক মারা যাচ্ছে, তাও সত্য। ও কথা বাদ দাও। তোমার বিয়ে দেয়ার জন্য আনোয়ারকে বললাম। শুনে বলল, সে একটা ভালো ছেলে দেখেছে। তুমি নাকি রাজি হচ্ছ না?

ছেলেটার পরিচয় বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

না করিনি। তুমি ছেলেটাকে চেন নাকি?

শুধু আমি নই, সবাই তাকে চেনে এবং আপনিও চেনেন।

আমি তাকে চিনি!

হ্যাঁ, আপনিও চেনেন, ছেলেটা হল পান্থ।

দাদু মুখে চুকচুক করে শব্দ করে বললেন, কথাটা শুনে খুব দুঃখ পেলাম। পান্থকে নাতজামাই করতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম। কিন্তু ভাগ্যে নেই। তাই ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। অন্য মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। আনোয়ার তো অন্য ছেলের কথা বলল।

দাদুর কথা শুনে বহ্নি চমকে উঠে বলল, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কার কাছে শুনলেন?

দাদু বললেন, কার কাছে আর শুনব, পান্থ নিজে আমাকে বলেছে। তুমি চলে আসার পর যেদিন আমাদের পুকুর ও জমি রেজিষ্ট্রি হল, সেদিন তার মন খুব খারাপ দেখলাম। কাজ মিটে যাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মন এত খারাপ কেন? পান্থ বলল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মায়ের একটা অন্তিম আদেশ পালন করতে হয়েছে। সেটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মা কি এমন আদেশ করেছিলেন যার ফলে তোমার এত মন খারাপ? পান্থ বলল, শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন। বললাম, তবু শুনব তুমি বল। পান্থ বলল, এবারে ঢাকায় গিয়ে দেখি মা শয্যাশায়ী। আমি কাছে গিয়ে বললাম, কি হয়েছে মা? তোমার এরকম অবস্থা আমাকে জানাওনি কেন? মা বললেন, গতকাল থেকে হঠাৎ হার্টের ট্রাবল দেখা দিয়েছে। তারপর আমার দুটো হাত ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, আমি হয়তো আর বাঁচব না। যে ক'দিন বাঁচি এর মধ্যে তুই যদি বিয়ে করতিস, তা হলে বৌ দেখে মরতে পারতাম। তখন আমি বহ্নির পরিচয় দিয়ে বললাম, তুমি বাবাকে তার বাবার সঙ্গে কথা বলে বিয়ের ব্যবস্থা কর। বাবা মায়ের কাছ থেকে জেনে আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন– বহ্নি এ বিয়েতে রাজি নয়। সে কথা মা আমাকে বলে অন্য মেয়েকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বহ্নির অমতের কথা শুনে আমি মনে খুব আঘাত পাই। ভেবেছিলাম, জীবনে কোনোদিন বিয়ে করব না। কিন্তু মানুষ যা চিন্তা করে তা সব সময় সফল হয় না। ভাগ্যের হাতে মানুষ বন্দি। তাই আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে মায়ের অবস্থার আরও অবনতি হয়। শেষে মায়ের আদেশ পালন করতে বাধ্য হলাম। খুব তাড়াহুড়ো করে দু'তিন দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর মা একটু সুস্থ হতে এখানে ফিরে এলাম। তার কথা শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবু তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য বললাম, কি আর করবে ভাই, সবই তকদ্বির। ছেলে হিসাবে মায়ের আদেশ পালন করে খুব ভালো কাজ করেছ।

এবার দাদু বহ্নিকে বললেন, এখন বিশ্বাস হল তো? না হলে পান্থদের বাসায় ফোন করে জানতে পার।

পান্থর বিয়ে হয়ে গেছে শোনার পর থেকে বহ্নির মনে যে রাগ ও অভিমানের ঝড় বইছিল, দাদুর কথা শেষ হতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। খুব রাগের সঙ্গে বলল, আমি আপনাকে বলেছিলাম না, সে একটা অভদ্র, অহঙ্কারী? এখন মনে হচ্ছে, সে শুধু তাই নয়, ইতরও।

দাদু বললেন, বেচারাকে শুধু শুধু তুমি রেগে গিয়ে গালাগালি করছ; আমি তো তার কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

বহ্নি বলল, শুধু আপনি কেন, কেউই তার দোষ দেখতে পাবে না। আমি তাকে চিনি, তাই গালাগালি করছি।

দাদু বললেন, তোমার কথাই ঠিক। তোমার কথা শুনে আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। তাকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে ভালই করেছ। এবার তোমার উচিত বিয়ে করে ঐ অভদ্র ইতরটার উপর প্রতিশোধ নেয়া।

বহ্নি রাগের মাথায় ঐ সব বলল বটে, কিন্তু তার মন তখন অনুশোচনার আগুনে জ্বলছে। কেন সে মেয়ে হয়ে পান্থর কাছে আগে নতি স্বীকার করল না? সে তার বাবাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, রাজি হলাম না কেন? এসব ভেবে বহ্নির চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। দাদুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গেল।

কয়েকদিন পর হঠাৎ নিয়াজ মাতব্বরের হার্টের ট্রাবল দেখা দিল। আনোয়ার সাহেব একজন হার্ট স্পেশালিষ্টকে নিয়ে এলেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, ওঁর কমপ্লিট রেষ্ট দরকার। ওঁর সামনে কোনো কিছু আলোচনা করবেন না। কোনো কারণে উত্তেজিত হলে হার্টফেল করতে পারেন। কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতালে ভর্তি করে দিন।

নিয়াজ মাতব্বর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হলেন না। বললেন, মরতে হয় ঘরেই মরব, তবু ক্লিনিক বা হাসপাতালে যাব না।

দাদুর অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে ইভা ও মারুফ একদিন দেখতে এল। আনোয়ার সাহেব, তাসনিমা বেগম, ইভা, মারুফ ও বহ্নি সবাই ওঁর কাছে রয়েছে। এক সময় দাদু বহ্নিকে বললেন, দাদু ভাই, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও তো?

বহ্নি হাত বুলোতে লাগল। একটু পরে দাদু বহ্নির হাতের উপর একটা হাত রেখে ধরা গলায় বললেন, তুমি ভাই আমার একটা কথা রাখবে? যদি রাখ, তা হলে খুব শান্তির সঙ্গে মরতে পারতাম।

দাদুর কথা শুনে বহ্নি বুঝতে পারল, কি বলবেন। তবু বলল, বলুন, আমি যতদূর সম্ভব রাখার চেষ্টা করব।

দাদু বললেন, তোমার বিয়ে আমি দেখতে চাই। তারপর চোখের পানি মুছে বললেন, আনোয়ার আমার একমাত্র সন্তান। আর তোমারা দু'বোন তার মেয়ে। আমার কোনো নাতি নেই। ইভার বিয়ে দিয়ে একটা নাতি পেয়েছি, তোমার বিয়ে দিয়ে আর একটা নাতি পেতে চাই। ইভা ও মারুফকে দেখে খুব শান্তি পাই। তোমার পাশেও একজনকে দেখে শান্তি পেতে চাই। তুমি কি আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবে?

ওঁর চোখের পানি দেখে সকলের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। বহ্নি মাথা নি করে রইল।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর তাসনিমা বেগম শ্বশুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন বাবা আপনি ওর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করবেন না। ডাক্তার আপনাকে কোনো ব্যাপারে চিন্ত করতে নিষেধ করেছেন।

ইভা এগিয়ে এসে বহ্নির একটা হাত ধরে বলল, তুই শিক্ষিত মেয়ে হয়ে যদি এ রকম করসি, তা হলে শিক্ষার মূল্য দিলি কই? তা ছাড়া সব থেকে বড় কথা, দাদু মুরুব্বি মানুষ। তার অন্তিম মুহূর্তের কথা তোর মেনে নেয়া উচিত।

বহ্নি এ ক'দিন পান্থর কথা ভেরে ভেবে নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করেছে। পান্থ যদি তার মায়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে পারে, তা হলে আমিই বা দাদুর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করব না কেন? চোখের পানি মুছে বলল, আমি দাদুর ইচ্ছা পূরণ করব। এ কথা বলে উঠে চলে গেল।

বহ্নির বিয়ের ধুমধাপ পড়ে গেল। দু'দিন পর বিয়ে। ইভা তাকে বলল, দাদুর অসুখের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি তোর বিয়েটা হচ্ছে। তাই তোর বরের সঙ্গে বিয়ের আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া গেল না। তুই চাইলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

বহ্নি বলল, বিয়েই যখন করছি তখন আর ঐসবের দরকার নেই।

ইভা বলল, নামটা অন্তত জেনে নে। ছেলেটার নাম আজরাফ। খুব সুন্দর নাম, তাই না?

বহ্নি বলল, নাম সুন্দর হলে কি হবে গুণটাই হল আসল।

ইভা বলল, তোর কথা অবশ্য ঠিক। তবে তাকে আমি দেখেছি এবং দু'চারটে কথাও বলেছি। তাতেই বুঝেছি যেমন সুন্দর তেমনি বুদ্ধিমান। আজরাফ মানে বুদ্ধিমান। তারপর হেসে উঠে বলল, নামের সঙ্গে চরিত্রের দারুণ মিল।

বহ্নি বলল, তুমি এখন যাও তো, কত সুন্দর আর বুদ্ধিমান পরে দেখা যাবে।

ইভা মুচকি হেসে চলে গেল।

ঢাকার এক অভিজাত হোটেলে বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। পান্থর কথামতো সেখানেই বাসর রাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিয়ের কাজ এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর নিমন্ত্রিত অতিথিরা চলে গেল। পান্থর দূর-সম্পর্কের দু'তিন জন মেয়ে বহ্নিকে যখন বাসর ঘরে নিয়ে এল তখন রাত একটা।

বহ্নি খাটের উপর বসতে চাইল না। মেয়েগুলো জোর করে তাকে বসিয়ে বলল, এটাই বাসর রাতের নিয়ম। তারপর চলে যাওয়ার সময় একজন শাড়ির আঁচল মুখের উপর টেনে ঘোমটা দিয়ে বলল, এটাও নিয়ম। এ কথা বলে তারা খিলখিল করে হাসতে হাসতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পর বহ্নি ঘোমটা পেছন থেকে টেনে মাথার উপর নিয়ে এল। তারপর মাথা নিচু করে দুরুদুরু বুকে বরের অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তার পান্থর কথা মনে পড়ল। আজ যদি তার সাথে বিয়ে হত? কাউকে রুমে ঢুকতে দেখে চিন্তাটা থমকে গেল। কিন্তু পান্থর কথা মনে পড়তে তখন তার চোখ দুটো পানিতে ভরে গেছে। মাথাটা নিচু করে চোখের পানি মুছে ফেলল।

আজরাফ ঘরে ঢুকে প্রথমে দরজা বন্ধ করল। তারপর ধীরে ধীরে খাটের কাছে এগিয়ে এসে চিন্তা করল, বহ্নি আমাকে দেখে কি করবে? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাহস সঞ্চয় করল। তারপর এক পা খাটের উপর তুলে হাটু মুড়ে বসল। বৌকে মাথা নিচু করে থাকতে দেখে ডান হাত দিয়ে চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরল। তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে দেখে বলল, তুমি কি পূর্ব-প্রেমিককে ভুলতে পারছ না? আমি কিন্তু সব কিছু জেনেই তোমাকে বিয়ে করেছি। ভেবেছিলাম, কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ার সময় সব ছেলেমেয়েদের ওরকম হয়ে থাকে। তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ। পাস্ট ইজ পাস্ট ভেবে সে সব কথা ভুলে যাও। অবশ্য তোমাদের ব্যাপারটা একটু অন্য ধরণের শুনেছি। তুমি নাকি যতটা না তাকে ভালবাসতে তার চেয়ে সে অনেক বেশি তোমাকে ভালবাসত। তবু যে কেন সে তোমার সঙ্গে বিট্রে করল বুঝতে পারছি না। আসলে মনে হয় ছেলেটা সত্যিই খুব ছোটলোক ও ইতর।

আজরাফ চিবুক ধরে বহ্নির মুখ তুলে ধরলেও এতক্ষণ বহ্নি চোখ বন্ধ করে ছিল। তার কথা ও গলার স্বর শুনে কেমন সন্দেহ হল। চোখ মেলে তাকিয়ে একবার চমকে উঠে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। বহ্নির তখন দাদুর হঠাৎ আগমন ও তার সমস্ত কার্যকলাপ একের পর এক মনে পড়তে লাগল। বুঝতে পারল, পান্থকে বিয়ে করতে রাজি হইনি বলে অতি সুকৌশলে তিনি এ কাজ করালেন। একটু আগে পান্থকে হারাবার দুঃখে চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরাচ্ছিল, তা আনন্দ অশ্রুতে পরিণত হল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। পান্থ বলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ভিজে গলায় বলল, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

পান্থ তাকে বুকে চেপে ধরে বলল, স্বপ্ন নয়–সত্য। এস আল্লাহ পাকের কাছে দু'রাকাত শোকরানার নামায পড়ে শুকরিয়া আদায় করি। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি কি নামায পড়?

বহ্নি বলল, আগে পড়তাম না। ফুলবন থেকে ফিরে আসার পর থেকে পড়ি।

পান্থ তার নামায পড়ার কথা শুনে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তার কপালে একটা প্রেমের প্রথম নিদর্শন এঁকে দিয়ে বলল, এস শোকরানার নামাযটা আগে পড়ে নিই।

নামায পড়ে উঠে পান্থ বলল, দাদুর কাছে আমাকে বিয়ে করতে তোমার অমত শুনে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ পাকের হাজারো শুকরিয়া তিনি আমাকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচালেন।

বহ্নি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, শেষের দিকে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা চেয়ে তোমাকে পেতে চেয়েছি। কিন্তু নিজের স্বভাবের কারণে সে কথা কাউকে বলতে পারিনি।

পান্থ বলল, আল্লাহ অফুরন্ত দয়ার সাগর। নচেৎ কোনো মানুষই এতটুকু অন্যায় করে পার পেত না। আমার কিন্তু একটু আগে খুব ভয় ভয় করছিল। আমাকে দেখে যদি তুমি আগের মতো রেগে যাও।

বহ্নি বলল, সে সব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না। আসল কথা কি জান, তোমার মনের কথা আমাকে জানাওনি বলে তোমার উপর আমার প্রচণ্ড রাগ ও অভিমান ছিল। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তুমি অগ্র ভূমিকা না নেয়া পর্যন্ত আমি রাজি হব না।

পান্থ বলল, আল্লাহ তোমার সেই বাসনা পূরণ করার জন্য আমাকে দাদুর প্ল্যান মেনে নিতে বাধ্য করালেন।

বহ্নি বসে পড়ে স্বামীর দু'পা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল, আগেকার আমার সব অন্যায় মাফ করে দিয়েছ, বল।

পান্থ তাকে দু'হাতে তুলে তার মাথায় চুমো খেয়ে বলল, আমিও তোমার কাছে অনেক ভুল করেছি। আমাকেও তুমি ক্ষমা করে দিয়েছ, বল।

বহ্নি স্বামীর দু'হাতে চুমো খেয়ে তাকে খাটে বসাল। তারপর সেও পাশে বসে বলল, এখনও সবকিছু আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না।

পান্থ বলল, সবকিছু বোঝাতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা আমাদের জীবন থেকে এমন একটা আনন্দের রাত হারাব। যা সারা জীবনে আর দ্বিতীয়বার ফিরে পাব না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছ এবং দাদুর হার্টের অসুখের বাড়াবাড়ি সব কিছু দাদুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, আর ইভা আপা ও মারুফ ভাইয়ের অবদান।

বহ্নি বলল, তোমারই বা অবদান কম কিসে? এখন বুঝতে পারছি, আমাকে জব্দ করার জন্য তুমি এরকম কলকাঠি নেড়েছ।

পান্থ বলল, বললাম না, কলকাঠির উদ্যোক্তা ও পরিকল্পনা দাদুর। আমি, ইভা আপা ও মারুফ ভাই শুধু তাঁর হুকুম তামিল করেছি।

বহ্নি বলল, কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছি দাদুর নিখুঁত অভিনয়ের কথা ভেবে।

পান্থ হাসতে হাসতে বলল, ইভা আপা ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছে।

বহ্নি স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে একটু জোরে কামড়ে দিয়ে বলল, আমাকে জব্দ করার শাস্তি।

পান্থ উহ্ করে উঠে বলল, লাগেনি বুঝি?

বহ্নি কপট রাগ দেখিয়ে বলল, এখন তো আস্তে কামড়ালাম, তখন আরও জোরে কামড়াব।

পান্থ বলল, বেশি জোরে কামড়ালে আমিও প্রতিশোধ নেব। তারপর দু'হাতে তার মুখ ধরে নিজের মুখের কাছে এনে ফিসফিস করে বলল, তখন বলতে কখন?

বহ্নির মুখ থেকে হঠাৎ এমনি কথাটা বেরিয়ে গেছে। কোনো কিছু ভেবে বলেনি।

পান্থর কথা শুনে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেল। সে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল।

পান্থ ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, তুমি না বললেও আমি জানি। তারপর কয়েকটা চুমো খেয়ে বলল, তখন আমিও ছেড়ে কথা বলব না।

বহ্নি আরো বেশি লজ্জা পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি একটা যাচ্ছে-তাই লোক, এসব কথা কেউ মুখে বলে নাকি? তোমার মতো বোকা আর কেউ আছে কিনা জানি না। পরের বুদ্ধিতে প্রেমিকাকে বিয়ে করলে। বিয়ের পর আবার বোকার মতো কথা বলছ। তোমার নাম আজরাফ রাখা ঠিক হয়নি।

আমার নামের অর্থ জান মনে হচ্ছে? তোমার নামের অর্থটা জান?

আসল নামেরটা জানি না। তবে ডাক নামেরটা জানি।

বহ্নি মানে আগুন সবাই জানে। আমার নামের অর্থটা জানলে কার কাছে?

আপা বলেছে।

তোমারটা জানলে না কেন?

দরকার মনে করিনি।

এটা একটা কথা হল নাকি? নিজের নামের অর্থ প্রত্যেকেরই জানা উচিত।

পান্থ অনেক আগে রেবেকার কাছ থেকে তার নাম যে অনিকা তা জেনে নিয়েছিল। বলল, অনিকা মানে হল সুন্দরী। তুমি বোধ হয় জান না, সুন্দরী মেয়েরা মাকাল ফলের মতো। মাকাল ফল দেখতেই শুধু সন্দর, তাকে কেউ খায় না।

বহ্নি হেসে উঠে বলল, ছেলেরা কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের শুধু পছন্দই করে না, তাদেরকে পাবার জন্য পাগলও হয়।

পান্থ বলল, তোমার কথাটা বোকাদের জন্য প্রযোজ্য।

বহ্নি হাসতে হাসতে বলল, তুমি তো কলেজ লাইফ থেকে সেই মাকাল ফলের জন্য পাগল হয়েছিলে। তা হলে তুমিও তো তাদের দলে? তোমার আসল নাম পাল্টে রাখা উচিত।

পান্থ বলল, তুমি মাকাল ফল বলে আমি তোমাকে ভালবেসে বোকা হয়েছি। তুমি যদি বুদ্ধিমতী হতে, তা হলে আমিও বুদ্ধিমান হতাম।

বহ্নি বলল, হয়েছে বাবা হয়েছে। কে মাকাল ফল আর কে বোকা তা নিয়ে ঝগড়া করে এমন মধুরাতকে বোকাদের মতো নষ্ট করা কি উচিত হচ্ছে?

পান্থ বলল, সত্যি আমরা দু'জন বোকার মতো মূল্যবান ও মধুময় সময় নষ্ট করলাম। আর নয় কি বল? তারপর বহ্নিকে দু'হাতে তুলে খাটে শুইয়ে দিয়ে বলল, দেখা যাক কে কাকে কত জোরে কামড়াতে পারে।

বহ্নি ভীষণ লজ্জা পেয়ে গড়িয়ে খাটের অপর প্রান্তে গিয়ে বলল, ভালো হবে না কিন্তু!